আন নাম্‌ল

২৭

নামকরণ

দ্বিতীয় রুকূ'র চতুর্থ আয়াতে وادِ النمل –এর কথা বলা হয়েছে। সূরার নাম এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এমন সূরা যাতে নামূল এর কথা বলা হয়েছে। অথবা যার মধ্যে নামূল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীর দিক দিয়ে এ সূরা মক্কার মধ্যযুগের সূরাগুলোর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন মেলে। ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়েদের (রা) বর্ণনা হচ্ছে, "প্রথমে নাযিল হয় সূরা আশ্‌ শু'আরা তারপর আন নামূল এবং তারপর আল কাসাস।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় দু'টি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম ভাষণটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে চতুর্থ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ভাষণটি পঞ্চম রুকূ'র শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম ভাষণটিতে বলা হয়েছে, কুরআনের প্রথম নির্দেশনা থেকে একমাত্র তারাই লাভবান হতে পারে এবং তার সুসংবাদসমূহ লাভের যোগ্যতা একমাত্র তারাই অর্জন করতে পারে যারা এ কিতাব যে সত্যসমূহ উপস্থাপন করে সেগুলোকে এ বিশ্ব–জাহানের মৌলিক সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তারপর এগুলো মেনে নিয়ে নিজেদের বাস্তব জীবনেও আনুগত্য ও অনুসরণের নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু এ পথে আসার ও চলার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে আখেরাত অস্বীকৃতি। কারণ এটি মানুষকে দায়িত্বহীন, প্রবৃত্তির দাস ও দুনিয়াবী জীবনের প্রেমে পাগল করে তোলে। এরপর মানুষের পক্ষে আল্লাহর সামনে নত হওয়া এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনার ওপর নৈতিকতার বাঁধন মেনে নেয়া আর সম্ভব থাকে না। এ ভূমিকার পর তিন ধরনের চারিত্রিক আদর্শ পেশ করা হয়েছে।

একটি আদর্শ ফেরাউন, সামূদ জাতির সরদারবৃন্দ ও লূতের জাতির বিদ্রোহীদের। তাদের চরিত্র গঠিত হয়েছিল পরকাল চিন্তা থেকে বেপরোয়া মনোভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে। তারা কোন নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি।

পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে কল্যাণ ও সুকৃতির প্রতি আহবান জানিয়েছে তাদেরই তারা শত্রু হয়ে গেছে। যেসব অসৎকাজের জঘন্যতা ও কদর্যতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে প্রচ্ছন্ন নয় সেগুলোকেও তারা আকড়ে ধরেছে। আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হবার এক মুহূর্ত আগেও তাদের চেতনা হয়নি।

দ্বিতীয় আদর্শটি হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের। আল্লাহ তাঁকে অর্থ–সম্পদ, রাষ্ট্র–ক্ষমতা, পরাক্রম, মর্যাদা ও গৌরব এত বেশী দান করেছিলেন যে মক্কার কাফেররা তার কল্পনাও করতে পারতো না। কিন্তু এতসব সত্বেও যেহেতু তিনি আল্লাহর সামনে নিজকে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করতেন এবং তাঁর মধ্যে এ অনুভূতিও ছিল যে, তিনি যা কিছুই লাভ করেছেন সবই আল্লাহর দান তাই তাঁর মাথা সবসময় প্রকৃত নিয়ামত দানকারীর সামনে নত হয়ে থাকতো এবং আত্ম অহমিকার সামান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্র ও কার্যকলাপে পাওয়া যেতো না।

তৃতীয় আদর্শ সাবার রানীর। তিনি ছিলেন আরবের ইতিহাসের বিপুল খ্যাতিমান ধনাঢ্য জাতির শাসক। একজন মানুষকে অহংকার মদমত্ত করার জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন তা সবই তাঁর ছিল। যেসব জিনিসের জোরে একজন মানুষ আত্মম্ভরী হতে পারে তা কুরাইশ সরদারদের তুলনায় হাজার লক্ষগুণ বেশী তাঁর আয়ত্বাধীন ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন একটি মুশরিক জাতির অন্তরভুক্ত। পিতৃপুরুষের অনুসরণের জন্যও এবং নিজের জাতির মধ্যে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যেও তাঁর পক্ষে শিরক ত্যাগ করে তাওহীদের পথ অবলম্বন করা সাধারণ একজন মুশরিকের জন্য যতটা কঠিন হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন ছিল। কিন্তু যখনই তাঁর সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তখনই তিনি সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এ পথে কেউ বাধা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কারণ তাঁর মধ্যে যে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি ছিল নিছক একটি মুশরিকী পরিবেশে চোখ মেলার ফলেই তা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবৃত্তির উপাসনা ও কামনার দাসত্ব করার রোগ তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাঁর বিবেক আল্লাহর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি শূন্য ছিল না।

দ্বিতীয় ভাষণে প্রথমে বিশ্ব–জাহানের কয়েকটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্যের প্রতি ইংগিত করে মক্কার কাফেরদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ বলো, যে শিরকে তোমরা লিপ্ত হয়েছো এ সত্যগুলো কি তার সাক্ষ দেয় অথবা এ কুরআনে যে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার সাক্ষ দেয়? এরপর কাফেরদের আসল রোগের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে জিনিসটি তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে, যে কারণে তারা সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না এবং সবকিছু শুনেও কিছুই শোনে না সেটি হচ্ছে আসলে আখেরাত অস্বীকৃতি। এ জিনিসটিই তাদের জন্য জীবনের কোন বিষয়েই কোন গভীরতা ও গুরুত্বের অবকাশ রাখেনি। কারণ তাদের মতে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই যখন ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে যাবে এবং দুনিয়ার জীবনের এসব সংগ্রাম-সাধনার কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না তখন মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যা সব সমান। তার জীবন ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না অসত্যের ওপর, এ প্রশ্নের মধ্যে তার জন্য আদতে কোন গুরুত্বই থাকে না।

কিন্তু আসলে এ আলোচনার উদ্দেশ্য হতাশা নয়। অর্থাৎ তারা যখন গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে তখন তাদেরকে দাওয়াত দেয়া নিষ্ফল, এরূপ মনোভাব সৃষ্টি এ আলোচনার

উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে নিদ্রিতদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগানো। তাই ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকৃ'তে একের পর এক এমন সব কথা বলা হয়েছে যা লোকদের মধ্যে আখেরাতের চেতনা জাগ্রত করে, তার প্রতি অবহেলা ও গাফিলতি দেখানোর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে এবং তার আগমনের ব্যাপারে তাদেরকে এমনভাবে নিশ্চিত করে যেমন এক ব্যক্তি নিজের চোখে দেখা ঘটনা সম্পর্কে যে তা চোখে দেখেনি তাকে নিশ্চিত করে।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে কুরআনের আসল দাওয়াত অর্থাৎ এক আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত অতি সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী ভংগীতে পেশ করে লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ দাওয়াত গ্রহণ করলে তোমাদের নিজেদের লাভ এবং একে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। একে মেনে নেবার জন্য যদি আল্লাহর এমন সব নিদর্শনের অপেক্ষা করতে থাকো যেগুলো এসে যাবার পর আর না মেনে কোন গত্যন্তর থাকবে না, তাহলে মনে রেখো সেটি চূড়ান্ত মীমাংসার সময়। সে সময় মেনে নিলে কোন লাভই হবে না।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿۱﴾ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿۳﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۴﴾

ত্বা–সীন। এগুলো কুরআনের ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত[১], পথনির্দেশ ও সুসংবাদ[২] এমন মুমিনদের জন্য যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়[৩] এবং তারা এমন লোক যারা আখেরাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে[৪] আসলে যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি তাদের কৃতকর্মকে সুদৃশ্য করে দিয়েছি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।[৫]

১. "সুস্পষ্ট কিতাবের" একটি অর্থ হচ্ছে. এ কিতাবটি নিজের শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশগুলোর একেবারে দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে দেয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এটি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে তুলে ধরে। আর এর তৃতীয় একটি অর্থ এই হয় যে, এটি যে আল্লাহর কিতাব সে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি চোখ খুলে এ বইটি পড়বে, এটি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের তৈরী করা কথা নয় তা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো হচ্ছে পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। "পথনির্দেশকারী" ও "সুসংবাদদানকারী" বলার পরিবর্তে এগুলোকেই বলা হয়েছে "পথনির্দেশ" ও "সুসংবাদ" এর মাধ্যমে পথনির্দেশনা ও সুসংবাদ দানের গুণের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণতার প্রকাশই কাম্য। যেমন কাউকে দাতা বলার পরিবর্তে 'দানশীলতার প্রতিমূর্তি' এবং সুন্দর বলার পরিবর্তে 'আপাদমস্তক সৌন্দর্য' বলা।

৩. অর্থাৎ কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো কেবলমাত্র এমনসব লোকদেরই পথ–নির্দেশনা দেয় এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদও একমাত্র এমনসব লোকদের দান করে যাদের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট ও গুণাবলী পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে, তারা ঈমান আনে। ঈমান

আনার অর্থ হচ্ছে তারা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করে। এক আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র উপাস্য ও রব বলে মেনে নেয়। কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে স্বীকার করে নেয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়ে নিজেদের নেতা রূপে গ্রহণ করে। এ সংগে এ বিশ্বাসও পোষণ করে যে, এ জীবনের পর দ্বিতীয় আর একটি জীবন আছে, সেখানে আমাদের নিজেদের কাজের হিসেব দিতে এবং প্রত্যেকটি কাজের প্রতিদান লাভ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তারা এ বিষয়গুলো কেবলমাত্র মেনে নিয়েই বসে থাকে না বরং কার্যত এগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এ উদ্বুদ্ধ হবার প্রথম আলামত হচ্ছে এই যে, তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। এ দু'টি শর্ত যারা পূর্ণ করবে কুরআন মজীদের আয়াত তাদেরকেই দুনিয়ায় সত্য সরল পথের সন্ধান দেবে। এ পথের প্রতিটি পর্যায়ে তাদেরকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। তার প্রত্যেকটি চৌমাথায় তাদেরকে ভুল পথের দিকে অগ্রসর হবার হাত থেকে রক্ষা করবে। তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দান করবে যে, সত্য–সঠিক পথ অবলম্বন করার ফল দুনিয়ায় যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তারই বদৌলতে চিরন্তন সফলতা তারাই অর্জন করবে এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হবে। এটা ঠিক তেমনি একটি ব্যাপার যেমন একজন শিক্ষকের শিক্ষা থেকে কেবলমাত্র এমন এক ব্যক্তি লাভবান হতে পারে যে তার প্রতি আস্থা স্থাপন করে যথার্থই তার ছাত্রত্ব গ্রহণ করে নেয় এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজও করতে থাকে। একজন ডাক্তার থেকে উপকৃত হতে পারে একমাত্র এমনই একজন রোগী যে তাকে নিজের চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঔষধপত্র ও পথ্যাদির ব্যাপারে তার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করে। একমাত্র এ অবস্থায়ই একজন শিক্ষক ও ডাক্তার মানুষকে তার কাংখিত ফলাফল লাভ করার নিশ্চয়তা দান করতে পারে।

কেউ কেউ এ আয়াতে يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ বাক্যাংশের অর্থ গ্রহণ করেছেন, যারা চারিত্রিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে। কিন্তু কুরআন মজীদে নামায কায়েম করার সাথে যাকাত আদায় করার শব্দ যেখানেই ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয়েছে যাকাত দান করা। নামাযের সাথে এটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এ ছাড়াও যাকাতের জন্য ايتاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি সম্পদের যাকাত দান করার সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যক্ত করে। কারণ আরবী ভাষায় পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে تزكى শব্দ বলা হয়ে থাকে, ايتاء زكوة বলা হয় না। আসলে এখানে যে কথাটি মনে বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে এই যে, কুরআনের পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হবার জন্য ঈমানের সাথে কার্যত আনুগত্য ও অনুসরণের নীতি অবলম্বন করাও জরুরী। আর মানুষ যথার্থই আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করেছে কিনা নামায কায়েম ও যাকাত দান করাই হচ্ছে তা প্রকাশ করার প্রথম আলামত। এ আলামত যেখানেই অদৃশ্য হয়ে যায় সেখানেই বুঝা যায় যে, মানুষ বিদ্রোহী হয়ে গেছে, শাসককে সে শাসক বলে মেনে নিলেও তার হুকুম মেনে চলতে রাজী নয়।

৪. যদিও আখেরাত বিশ্বাস ঈমানের অংগ এবং এ কারণে মু'মিন বলতে এমনসব লোক বুঝায় যারা তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে সাথে আখেরাতের প্রতিও ঈমান আনে

কিন্তু এটি আপনা আপনি ঈমানের অন্তরভুক্ত হওয়া সত্বেও এ বিশ্বাসটির গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বিশেষ জোর দিয়ে একে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের জন্য এ কুরআন উপস্থাপিত পথে চলা বরং এর ওপর পা রাখাও সম্ভব নয়। কারণ এ ধরনের চিন্তাধারা যারা পোষণ করে তারা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ভালমন্দের মানদণ্ড কেবলমাত্র এমন সব ফলাফলের মাধ্যমে নির্ধারিত করে থাকে যা এ দুনিয়ায় প্রকাশিত হয় বা হতে পারে। তাদের জন্য এমন কোন পথনির্দেশনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না যা পরকালের পরিণাম ফলকে লাভ–ক্ষতির মানদণ্ড গণ্য করে ভালো ও মন্দ নির্ধারণ করে। এ ধরনের লোকেরা প্রথমত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শিক্ষায় কর্ণপাত করে না। কিন্তু যদি কোন কারণে তারা মুমিন দলের মধ্যে শামিল হয়েও যায় তাহলে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকার ফলে তাদের জন্য ঈমান ও ইসলামের পথে এক পা চলাও কঠিন হয়। এ পথে প্রথম পরীক্ষাটিই যখন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ইহকালীন লাভ ও পরকালীন ক্ষতির দাবী তাদেরকে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দিকে টানতে থাকবে তখন মুখে যতই ঈমানের দাবী করতে থাকুক না কেন নিসংকোচে তারা ইহকালীন লাভের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পরকালীন ক্ষতির সামান্যতমও পরোয়া করবে না।

৫. অর্থাৎ এটি আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম আর মানবিক মনস্তত্বের স্বাভাবিক যুক্তিবাদিতাও একথাই বলে যে, যখন মানুষ জীবন এবং তার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফলাফলকে কেবলমাত্র এ দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করবে, যখন সে এমন কোন আদালত স্বীকার করবে না যেখানে মানুষের সারা জীবনের সমস্ত কাজ যাচাই–পর্যালোচনা করে তার দোষ–গুণের শেষ ও চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে, এবং যখন সে মৃত্যুর পরে এমন কোন জীবনের কথা স্বীকার করবে না যেখানে দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা অনুযায়ী যথাযথ পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে তখন অনিবার্যভাবে তার মধ্যে একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী বিকাশ লাভ করবে। তার কাছে সত্য ও মিথ্যা, শিরক ও তাওহীদ, পাপ ও পূণ্য এবং সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্রের যাবতীয় আলোচনা একেবারেই অর্থহীন মনে হবে। এ দুনিয়ায় যা কিছু তাকে ভোগ, আয়েশ–আরাম, বস্তুগত উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং শক্তি ও কর্তৃত্ব দান করবে, তা কোন জীবন দর্শন, জীবন পদ্ধতি ও নৈতিক ব্যবস্থা হোক না কেন, তার কাছে তাই হবে কল্যাণকর। প্রকৃত তত্ব ও সত্যের ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা থাকবে না। তার মৌল আকাংখা হবে কেবলমাত্র দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সাফল্য। এগুলো অর্জন করার চিন্তা তাকে সকল পথে বিপথে টেনে নিয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে যা কিছুই করবে তাকে নিজের দৃষ্টিতে মনে করবে বড়ই কল্যাণকর এবং যারা এ ধরনের বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারে ডুব দেয়নি এবং চারিত্রিক সততা ও অসততা থেকে বেপরোয়া হয়ে স্বেচ্ছাচারীর মত কাজ করে যেতে পারেনি তাদেরকে সে নির্বোধ মনে করবে।

কারো অসৎকার্যাবলীকে তার জন্য শোভন বানিয়ে দেবার এ কাজকে কুরআন মজীদে কখনো আল্লাহর কাজ আবার কখনো শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। যখন বলা হয় যে, অসৎকাজগুলোকে আল্লাহ শোভন করে দেন তখন তার অর্থ হয়, যে ব্যক্তি এ দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করে তার কাছে স্বভাবতই জীবনের এ সমতল পথই সুদৃশ্য অনুভূত হতে থাকে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۝٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝٦ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝٧ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨

এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি[৬] এবং আখেরাতে এরাই হবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। আর (হে মুহাম্মাদ) নিসন্দেহে তুমি এ কুরআন লাভ করছো এক প্রাজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে।[৭]

(তাদেরকে সেই সময়ের কথা শুনাও) যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বললো[৮] "আমি আগুনের মতো একটা বস্তু দেখেছি। এখনি আমি সেখান থেকে কোন খবর আনবো অথবা খুঁজে আনবো কোন অংগার, যাতে তোমরা উষ্ণতা লাভ করতে পারো।"[৯] সেখানে পৌছুবার পর আওয়াজ এলো[১০] "ধন্য সেই সত্তা যে এ আগুনের মধ্যে এবং এর চারপাশে রয়েছে, পাক–পবিত্র আল্লাহ সকল বিশ্ববাসীর প্রতিপালক।[১১]

আর যখন বলা হয় যে, শয়তান গুগুলোকে সুদৃশ্য করে দেয়। তখন এর অর্থ হয়, এ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বনকারী ব্যক্তির সামনে শয়তান সবসময় একটি কাল্পনিক জান্নাত পেশ করতে থাকে এবং তাকে এই বলে ভালোভাবে আশ্বাস দিতে থাকে, শাবাশ। বেটা খুব চমৎকার কাজ করছ।

৬. এ নিকৃষ্ট শাস্তিটি কিভাবে, কখন ও কোথায় হবে। তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কারণ এ দুনিয়া ও বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও জাতি নানাভাবে এ শাস্তি লাভ করে থাকে। এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় একেবারে মৃত্যুর দ্বারদেশেও জালেমরা এর একটি অংশ লাভ করে। মৃত্যুর পরে "আলমে বরযখে"ও (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পূর্ববর্তী সময়) মানুষ এর মুখোমুখি হয়। আর তারপর হাশরের ময়দানে এর একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এবং তারপর এক জায়গায় গিয়ে তা আর কোনদিন শেষ হবে না।

৭. অর্থাৎ এ কুরআনে যেসব কথা বলা হচ্ছে এগুলো কোন উড়ো কথা নয়। এগুলো কোন মানুষের আন্দাজ অনুমান ও মতামত ভিত্তিকও নয়। বরং এক জ্ঞানবান প্রাজ্ঞ সত্তা এগুলো নাযিল করছেন। তিনি নিজের সৃষ্টির প্রয়োজন ও কল্যাণ এবং তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন। বান্দাদের সংশোধন ও পথনির্দেশনার জন্য তাঁর জ্ঞান সর্বোত্তম কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

৮. এটা তখনকার ঘটনা যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মাদ্‌য়ানে আট দশ বছর অবস্থান করার পর নিজের পরিবারপরিজন নিয়ে কোন বাসস্থানের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। মাদ্‌য়ান এলাকাটি অবস্থিত ছিল আকাবা উপসাগরের তীরে আরব ও সিনাই উপদ্বীপের উপকূলে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ্‌ শু'আরা, ১১৫ টীকা)। সেখান থেকে যাত্রা করে হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে পৌঁছেন। এ অংশের যে স্থানটিতে তিনি পৌঁছেন বর্তমানে তাকে সিনাই পাহাড় ও মূসা পর্বত বলা হয়। কুরআন নাযিলের সময় এটি তূর নামে পরিচিত ছিল। এখানে যে ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে সেটি এরি পাদদেশে সংঘটিত হয়েছিল।

এখানে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরা "ত্বা-হা"-এর প্রথম রুকূতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সামনের দিকে সূরা কাসাসেও (চতুর্থ রুকূ') আসছে।

৯. আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে মনে হয় যে, এটা ছিল শীতকালের একটি রাত। হযরত মূসা একটি অপরিচিত এলাকা অতিক্রম করছিলেন। এ এলাকার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ জানাশোনা ছিল না। তাই তিনি নিজের পরিবারের লোকদের বললেন, আমি সামনের দিকে গিয়ে একটু জেনে আসি আগুন জ্বলছে কোন্‌ জনপদে, সামনের দিকে পথ কোথায় কোথায় গিয়েছে এবং কাছাকাছি কোন্‌ কোন্‌ জনপদ আছে। তবুও যদি দেখা যায়, ওরাও আমাদেরই মতো চলমান মুসাফির, যাদের কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যাবে না, তাহলেও অন্ততপক্ষে ওদের কাছ থেকে কিছু অংগার তো আনা যাবে। এ থেকে আগুন জ্বালিয়ে তোমরা উত্তাপ লাভ করতে পারবে।

হযরত মূসা (আ) যেখানে কুঞ্জবনের মধ্যে আগুন লেগেছে বলে দেখেছিলেন সে স্থানটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম খৃষ্টান বাদশাহ কনষ্টানটাইন ৩৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঠিক যে জায়গায় এ ঘটনাটি ঘটেছিল সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এর দু'শো বছর পরে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এখানে একটি আশ্রম (Monastery) নির্মাণ করেন। কনষ্টান্টাইনের গীর্জাকেও এর অন্তরভুক্ত করা হয়। এ আশ্রম ও গীর্জা আজো অক্ষুন্ন রয়েছে। এটি গ্রীক খৃষ্টীয় গীর্জার (Greek Orthodox Church) পাদ্রী সমাজের দখলে রয়েছে। আমি ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে এ জায়গাটি দেখি। পাশের পাতায় এ জায়গার কিছু ছবি দেয়া হলো।

১০. সূরা কাসাসে বলা হয়েছে, আওয়াজ আসছিল একটি বৃক্ষ থেকে ঃ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ এ থেকে ঘটনাটির যে দৃশ্য সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, উপত্যাকার এক কিনারে আগুনের মতো লেগে গিয়েছিল কিন্তু কিছু জ্বলছিল না এবং ধোঁয়াও উড়ছিল না। আর এ আগুনের মধ্যে একটি সবুজ শ্যামল গাছ দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে সহসা এ আওয়াজ আসতে থাকে।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে এ ধরনের অদ্ভূত ব্যাপার ঘটা চিরাচরিত ব্যাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম বার নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তখন হেরা গিরিগুহায় একান্ত নির্জনে সহসা একজন ফেরেশতা আসেন। তিনি তাঁর কাছে
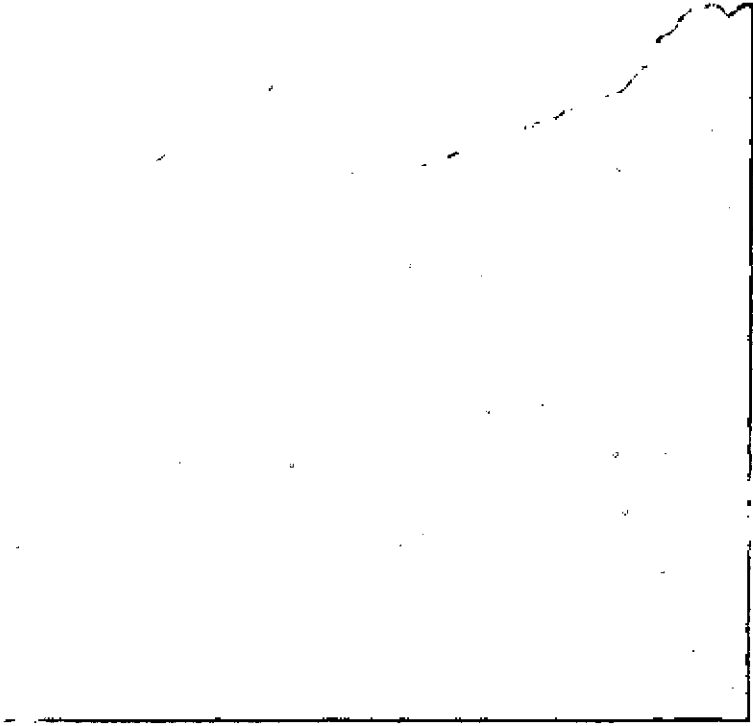
তূর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সেন্ট ক্যাথারাইন গীর্জা
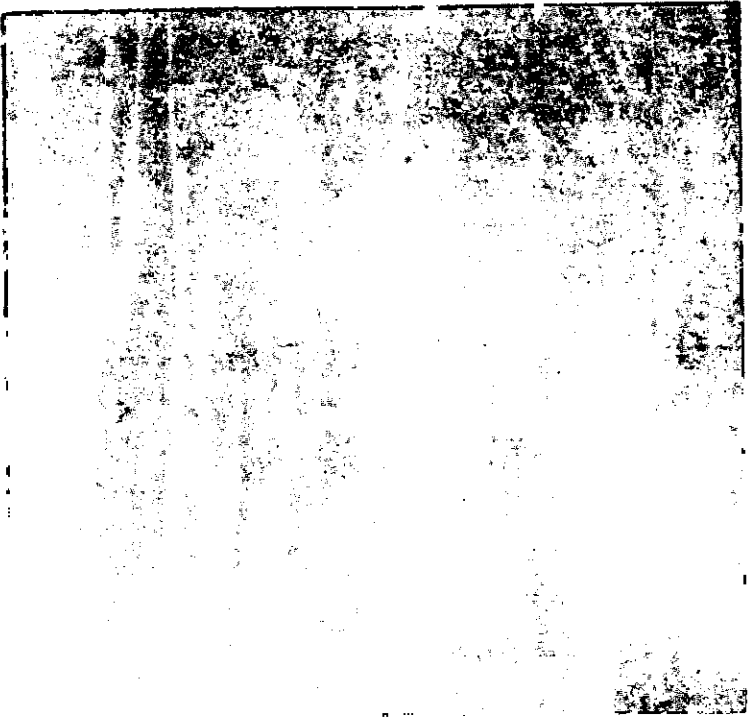
তূর পাহাড়ে সেন্ট ক্যাথারাইন গীর্জা যেখানে হযরত মূসা (আ) বৃক্ষকুঞ্জে প্রজ্জ্বলিত আগুন দেখেছিলেন
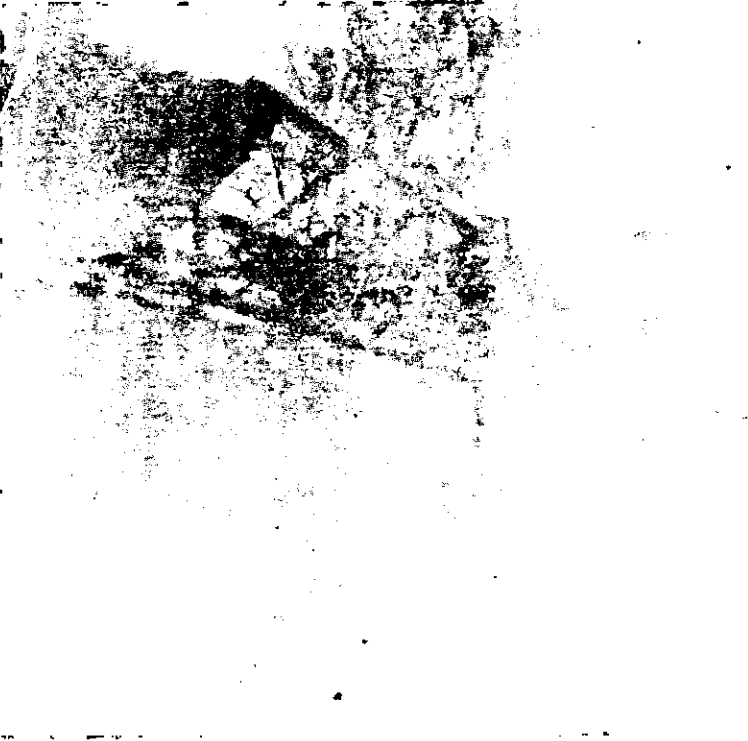
স্থানীয় বর্ণনানুসারে এ বৃক্ষের ওপর হতে হযরত মূসা (আ) আল্লাহর বাণী শুনেছেন। যুগ যুগ ধরে এ বৃক্ষের সবুজতার কথা বংশ পরম্পরায় গীর্জায় চলে আসছে

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۹﴾ وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۰﴾ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱﴾ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۱۲﴾

হে মূসা! এ আর কিছু নয়, স্বয়ং আমি আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী এবং তুমি তোমার লাঠিটি একটু ছুঁড়ে দাও।" যখনই মূসা দেখলো লাঠি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে[১২] তখনই পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং পেছন দিকে ফিরেও দেখলো না। "হে মূসা! ভয় পেয়ো না, আমার সামনে রসূলরা ভয় পায় না।[১৩] তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ভুল–ত্রুটি করে বসে।[১৪] তারপর যদি সে দুষ্কৃতির পরে সুকৃতি দিয়ে (নিজের কাজ) পরিবর্তিত করে নেয় তাহলে আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৫] আর তোমার হাতটি একটু তোমার বক্ষস্থলের মধ্যে ঢুকাও তো, তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই। এ (দু'টি নিদর্শন) ন'টি নিদর্শনের অন্তরভুক্ত ফেরাউন ও তার জাতির কাছে (নিয়ে যাবার জন্য)[১৬] তারা বড়ই বদকার।"

আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে থাকেন। হযরত মূসার ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটে। এক ব্যক্তি সফরকালে এক জায়গায় অবস্থান করছেন। দূর থেকে আগুন দেখে পথের সন্ধান নিতে বা আগুন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আসেন। অকস্মাত সকল প্রকার আন্দাজ অনুমানের উর্ধে অবস্থানকারী স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে সম্বোধন করেন। এসব সময় আসলে এমন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা বাইরেও এবং নবীগণের মনের মধ্যেও বিরাজমান থাকে যার ভিত্তিতে তাঁদের মনে এরূপ প্রত্যয় জন্মে যে, এটা কোন জিন বা শয়তানের কারসাজী অথবা তাদের নিজেদের কোন মানসিক ভাবান্তর নয় কিংবা তাঁদের ইন্দিয়ানুভূতিও কোন প্রকার প্রতারিত হচ্ছে না বরং প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব–জাহানের মালিক ও প্রভু অথবা তাঁর ফেরেশ্‌তাই তাঁদের সাথে কথা বলছেন। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাজম, ১০ টীকা)

১১. এ অবস্থায় "পাক–পবিত্র আল্লাহ" বলার মাধ্যমে আসলে হযরত মূসাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে যে, বিভ্রান্ত চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়েই এ

ঘটনাটি ঘটছে। অর্থাৎ এমন নয় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ গাছের ওপর বসে আছেন অথবা এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এসেছেন কিংবা তাঁর একচ্ছত্র নূর তোমাদের দৃষ্টিসীমায় বাঁধা পড়েছে বা কারো মুখে প্রবিষ্ট কোন জিহবা নড়াচড়া করে এখানে কথা বলছে। বরং এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থেকে সেই সত্তা নিজেই তোমার সাথে কথা বলছেন।

১২. সূরা আ'রাফ ও সূরা শু'আরাতে এ জন্য ثُعْبَانٌ (অজগর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একে جَانٌ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। "জান" শব্দটি বলা হয় ছোট সাপ অর্থে। এখানে "জান" শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক দিক দিয়ে সাপটি ছিল অজগর কিন্তু তার চলার দ্রুততা ছিল ছোট সাপদের মতো। সূরা তা-হা-য় حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (ছুটন্ত সাপ) এর মধ্যেও এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ আমার কাছে রসূলদের ক্ষতি হবার কোন ভয় নেই। রিসালাতের মহান মর্যাদায় অভিসিক্ত করার জন্য যখন আমি কাউকে নিজের কাছে ডেকে আনি তখন আমি নিজেই তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে থাকি। তাই যে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলেও রসূলকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। আমি তার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিকারক হবো না।

১৪. আরবী ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে এ বাক্যাংশের দু'রকম অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ হলো, ভয়ের কোন যুক্তিসংগত কারণ যদি থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, রসূল কোন ভুল করেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, যতক্ষণ কেউ ভুল না করে ততক্ষণ আমার কাছে তার কোন ভয় নেই।

১৫. অর্থাৎ অপরাধকারীও যদি তাওবা করে নিজের নীতি সংশোধন করে নেয় এবং খারাপ কাজের জায়গায় ভালো কাজ করতে থাকে, তাহলে আমার কাছে তার জন্য উপেক্ষা ও ক্ষমা করার দরজা খোলাই আছে। প্রসংগক্রমে একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে সতর্ক করা এবং অন্যদিকে সুসংবাদ দেয়াও। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অজ্ঞতাবশত একজন কিবতীকে হত্যা করে মিসর থেকে বের হয়েছিলেন। এটি ছিল একটি ত্রুটি। এদিকে সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়। এ ত্রুটিটি যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তখন তিনি পরক্ষণেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এই বলে ঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

"হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমাকে মাফ করে দাও।"

আল্লাহ সংগে সংগেই তাঁকে মাফ করে দিয়েছিলেন ঃ فَغَفَرَ لَهُ আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিলেন। (আল কাসাস, ১৬) এখানে সেই ক্ষমার সুসংবাদ তাঁকে দেয়া হয়। অর্থাৎ এ ভাষণের মর্ম যেন এই দাঁড়ালো ঃ হে মূসা ! আমার সামনে তোমার ভয় পাওয়ার একটি কারণ তো অবশ্যই ছিল। কারণ তুমি একটি ভুল করেছিলে। কিন্তু তুমি যখন সেই দুষ্কৃতিকে সুকৃতিতে পরিবর্তিত করেছো তখন আমার কাছে তোমার জন্য আর মাগফিরাত ও রহমত ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন আমি তোমাকে কোন শাস্তি দেবার জন্য ডেকে পাঠাইনি বরং বড় বড় মু'জিযা সহকারে তোমাকে এখন আমি একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদনে পাঠাবো।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑬ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ⑭

কিন্তু যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে এসে গেলো তখন তারা বলল, এতো সুস্পষ্ট যাদু। তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্যের সাথে সেই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো অথচ তাদের মন মগজ সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল।[১৭] এখন এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল দেখে নাও।

১৬. সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে মূসাকে আমি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এমন ধরনের নয়টি নিদর্শন (تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ) দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সূরা আ'রাফে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ (১) লাঠি, যা অজগর হয়ে যেতো (২) হাত, যা বগলে রেখে বের করে আনলে সূর্যের মতো ঝিকমিক করতো। (৩) যাদুকরদের প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাজিত করা (৪) হযরত মূসার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া। (৫) বন্যা ও ঝড় (৬) পংগপাল (৭) সমস্ত শস্য গুদামে শস্যকীট এবং মানুষ–পশু নির্বেশেষে সবার গায়ে উকুন। (৮) ব্যাংয়ের আধিক্য (৯) রক্ত। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আয্‌ যুখরুফ, ৪৩ টীকা)

১৭. কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে. যখন মূসা আলাইহিস সালামের ঘোষণা অনুযায়ী মিসরের ওপর কোন সাধারণ বালা–মুসীবত নাযিল হতো তখন ফেরাউন হযরত মূসাকে বলতো, আপনার আল্লাহর কাছে দোয়া করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন তারপর আপনি যা বলবেন তা মেনে নেবো। কিন্তু যখন সে বিপদ সরে যেতো তখন ফেরাউন আবার তার আগের হঠকারিতায় ফিরে যেতো। (সূরা আরাফ, ১৩৪ এবং আয্‌ যুখরুফ, ৪৯–৫০ আয়াত) বাইবেলেও এ আলোচনা এসেছে (যাত্রা পুস্তক ৮ থেকে ১০ অধ্যায়) তাছাড়া এমনিতেও একটি দেশের সমগ্র এলাকা দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও ঘূর্ণি কবলিত হওয়া, সারা দেশের ওপর পংগপাল ঝাঁপিয়ে পড়া এবং ব্যাং ও শস্যকীটের আক্রমণ কোন যাদুকরের তেলসমাতি হতে পারে বলে কোনক্রমেই ধারণা করা যেতে পারে না। এগুলো এমন প্রকাশ্য মু'জিযা ছিল যেগুলো দেখে একজন নিরেট বোকাও বুঝতে পারতো যে, নবীর কথায় এ ধরনের দেশ ব্যাপী বালা–মুসীবতের আগমন এবং আবার তাঁর কথায় তাদের চলে যাওয়া একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই হস্তক্ষেপের ফল হতে পারে। এ কারণে হযরত মূসা ফেরাউনকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"তুমি খুব ভালো করেই জানো, এ নিদর্শনগুলো পৃথিবী ও আকাশের মালিক ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি।" (বনী ইসরাঈল, ১০২)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾

২য় রুকূ'

(অন্যদিকে) আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করলাম[১৮] এবং তারা বললো, সেই আল্লাহর শোকর যিনি তাঁর বহু মু'মিন বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১৯] আর দাউদের উত্তরাধিকারী হলো সুলাইমান[২০] এবং সে বললো, "হে লোকেরা আমাকে শেখানো হয়েছে পাখিদের ভাষা[২১] এবং আমাকে দেয়া হয়েছে সবরকমের জিনিস।[২২] অবশ্যই এ (আল্লাহর) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।" সুলাইমানের জন্য জিন, মানুষ ও পাখিদের সৈন্য সমবেত করা হয়েছিল[২৩] এবং তাদেরকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

কিন্তু যে কারণে ফেরাউন ও তার জাতির সরদাররা জেনে বুঝে সেগুলো অস্বীকার করে তা এই ছিল ঃ

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ –

"আমরা কি আমাদের মতই দু'জন লোকের কথা মেনে নেবো, অথচ তাদের জাতি আমাদের গোলাম?" (আল ম'মিনূন, ৪৭)

১৮. অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান। আসলে তাদের কাছে নিজস্ব কোন জ্ঞান নেই, যা কিছু আছে তা আল্লাহর দেয়া এবং তা ব্যবহার করার যে ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। আর এ ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য তাদেরকে প্রকৃত মালিকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ফেরাউন যে মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিল এ জ্ঞান তার বিপরীতধর্মী। ফেরাউনী অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলে যে চরিত্র গড়ে উঠেছিল তার নমুনা ওপরে আলোচিত হয়েছে। এ জ্ঞান কোন্ ধরনের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ পেশ করে এখন তা বলা হচ্ছে। শাসন ক্ষমতা ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, শক্তি দু'পক্ষেরই সমান। ফেরাউনও এগুলো লাভ করেছিল এবং দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামও লাভ করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞতা তাদের মধ্যে কত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে।

১৯. অর্থাৎ অন্য মু'মিন বান্দাও এমন ছিল যাদেরকে খেলাফত দান করা যেতে পারতো। কিন্তু এটা আমাদের কোন ব্যক্তিগত গুণ নয় বরং নিছক আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের এ রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করেছেন।

২০. উত্তরাধিকার বলতে ধন ও সম্পদ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার বুঝানো হয়নি। বরং নবুওয়াত ও খিলাফতের ক্ষেত্রে হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্পদ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার যদি ধরে নেয়াও যায় তা স্থানান্তরিত হয়, তাহলে তা এককভাবে হযরত, সুলাইমানের দিকেই স্থানান্তরিত হতে পারতো না। কারণ হযরত দাউদের অন্যান্য সন্তানরাও ছিল। তাই এ আয়াত দ্বারা নবী (সা) এর নিম্নোক্ত হাদীস দু'টিকে খণ্ডন করা যায় না ঃ لا نورث ما تركنا صدقة "আমাদের নবীদের উত্তরাধিকার বন্টন করা হয় না, যা কিছু আমরা পরিত্যাগ করে যাই তা হয় সাদকা" (বুখারী, খুমুস প্রদান করা ফরয অধ্যায়) এবং

إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُوْرَثُ إِنَّمَا مِيْرَاثُهُ فِيْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَسَاكِيْنَ

"নবীর কোন উত্তরাধিকারী হয় না। যা কিছু তিনি ত্যাগ করে যান তা মুসলমানদের গরীব ও মিসকিনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু বকর সিদ্দীক বর্ণিত ৬০ ও ৭৮ নম্বর হাদীস)।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত দাউদের (আ) সবচেয়ে ছোট ছেলে। তাঁর আসল ইবরানী নাম ছিল সোলোমোন। এটি ছিল "সলীম" শব্দের সমার্থক। খৃষ্ট পূর্ব ৯৬৫ অব্দে তিনি হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং খৃঃ পূঃ ৯২৬ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। (তাঁর বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল হিজর ৭ টীকা, আল আম্বিয়া ৭৪-৭৫ টীকা।) তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে আমাদের মুফাসৃসিরগণ অতি বর্ণনের আশ্রয় নিয়েছেন অনেক বেশী। তারা তাঁকে দুনিয়ার অনেক বিরাট অংশের শাসক হিসেবে দেখিয়েছেন। অথচ তাঁর রাজ্য কেবলমাত্র বর্তমান ফিলিস্তীন ও জর্দান রাষ্ট্র সমন্বিত ছিল এবং সিরিয়ার একটি অংশ এর অন্তরভুক্ত ছিল। (দেখুন বাদশাহ সুলাইমানের রাজ্যের মানচিত্র, তাফহীমুল কুরআন সূরা বনী ইসরাঈল)

২১. হযরত সুলাইমানকে (আ) যে পশু-পাখির ভাষা শেখানো হয়েছিল, বাইবেলে সে কথা আলোচিত হয়নি। কিন্তু বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

২২. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সবকিছু আমার কাছে আছে। একথাটিকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জামের আধিক্য। হযরত সুলাইমান অহংকারে স্ফীত হয়ে একথা বলেননি। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দান ও দাক্ষিণ্যের শোকর আদায় করা।

২৩. জিনেরা যে হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অংশ ছিল এবং তিনি তাদের কাজে নিয়োগ করতেন, বাইবেলে একথারও উল্লেখ নেই। কিন্তু তালমূদে ও রাব্বীদের বর্ণনায় এর বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْۤ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

(একবার সে তাদের সাথে চলছিল) এমন কি যখন তারা সবাই পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌছুল তখন একটি পিঁপড়ে বললো, "হে পিঁপড়েরা! তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো। যেন এমন না হয় যে, সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তোমাদের পিশে ফেলবে এবং তারা তা টেরও পাবে না।"[২৪] সুলাইমান তার কথায় মৃদু হাসলো এবং বললো,– "হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো,[২৫] আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা–মাতার প্রতি করেছো এবং এমন সৎকাজ করি যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো।"[২৬]

বর্তমান যুগের কোন কোন ব্যক্তি একথা প্রমাণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যে, জিন ও পাখি বলে আসলে জিন ও পাখির কথা বুঝানো হয়নি বরং মানুষের কথা বুঝানো হয়েছে। মানুষরাই হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা বলেন, জিন মানে পার্বত্য উপজাতি। এদের ওপর হযরত সুলাইমান বিজয় লাভ করেছিলেন। তাঁর অধীনে তারা বিস্ময়কর শক্তি প্রয়োগের ও মেহনতের কাজ করতো। আর পাখি মানে অশ্বারোহী সেনাবাহনী। তারা পদাতিক বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী দ্রুততা সম্পন্ন ছিল। কিন্তু এটি কুরআন মজীদের শব্দের অযথা বিকৃত অর্থ করার নিকৃষ্টতম প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন এখানে জিন, মানুষ ও পাখি তিনটি আলাদা আলাদা প্রজাতির সেনাদলের কথা বর্ণনা করছে এবং তিনের ওপর ال (আলিফ লাম) বসানো হয়েছে তাদের পৃথক পৃথক প্রজাতিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে। তাই আল জিন (জিন জাতি) ও আত্‌তাইর (পাখি জাত) কোনক্রমেই আল ইন্‌স (মানুষ জাতি)–এর অন্তরভুক্ত হতে পারে না। বরং তারা তার থেকে আলাদা দু'টি প্রজাতিই হতে পারে। তাছাড়া যে ব্যক্তি সামান্য আরবী জানে সে–ও কখনো একথা কল্পনা করতে পারে না যে, এ ভাষায় নিছক জিন শব্দ বলে তার মাধ্যমে মানুষদের কোন দল বা নিছক পাখি (তাইর) শব্দ বলে তার মাধ্যমে অশ্বারোহী বাহিনী অর্থ করা যেতে পারে এবং কোন আরব এ শব্দগুলো শুনে তার এ অর্থ বুঝতে পারে। নিছক প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ী কোন

মানুষকে তার অস্বাভাবিক কাজের কারণে জিন অথবা কোন মেয়েকে তার সৌন্দর্যের কারণে পরী কিংবা কোন দ্রুতগতি সম্পন্ন পুরুষকে পাখি বলা হয় বলেই এর অর্থ এ হয় না যে, এখন জিন মানে শক্তিশালী লোক, পরী মানে সুন্দরী মেয়ে এবং পাখি মানে দ্রুতগতি সম্পন্ন মানুষই হবে। এ শব্দগুলোর এসব অর্থ তো তাদের রূপক অর্থ, প্রকৃত অর্থ নয়। আর কোন বাক্যের মধ্যে কোন শব্দকে তার প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থে তখনই ব্যবহার করা হয় বা শ্রোতা তার রূপক অর্থ তখনই গ্রহণ করে যখন আশেপাশে এমন কোন সুস্পষ্ট প্রসংগ ও পূর্বাপর সামঞ্জস্য থাকে যা তার রূপক অর্থের দবী জানায়। এখানে এমন কি প্রসংগ ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, জিন ও পাখি শব্দ দু'টি তাদের প্রকৃত অর্থে নয় বরং রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? বরং সামনের দিকে ঐ দু'টি দলের প্রত্যেক ব্যক্তির যে অবস্থা ও কাজ বর্ণনা করা হয়েছে তা এ পেঁচালো ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিরোধী অর্থ প্রকাশ করছে। কুরআনের কথায় কোন ব্যক্তির মন যদি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে না পারে, তাহলে তার পরিষ্কার বলে দেয়া উচিত আমি একথা মানি না। কিন্তু মানুষ কুরআনের পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন শব্দগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে নিজের মনের মতো অর্থের ছাঁচে সেগুলো ঢালাই করবে এবং একথা প্রকাশ করতে থাকবে যে, সে কুরআনের বর্ণনা মানে, অথচ আসলে কুরআন যা কিছু বর্ণনা করেছে সে তাকে নয় বরং নিজের জোর করে তৈরী করা অর্থই মানে— এটি মানুষের একটি মস্তবড় চারিত্রিক কাপুরুষতা ও তাত্ত্বিক খেয়ানত ছাড়া আর কী হতে পারে।

২৪. আজকালকার কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতটিরও পেঁচালো ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেন, "ওয়াদী–উন্‌–নাম্‌ল" মানে পিঁপড়ের উপত্যকা নয় বরং এটি ছিল সিরীয় এলাকায় অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। আর "নাম্‌লাহ্‌ মানে একটি পিঁপড়ে নয় বরং এটি একটি গোত্রের নাম। এভাবে তারা এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেন, "যখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নাম্‌ল উপত্যকায় পৌঁছেন তখন একজন নাম্‌লী বললো, "হে নাম্‌ল গোত্রের লোকেরা ....।" কিন্তু এটিও এমন একটি পেঁচালো ব্যাখ্যা কুরআনের শব্দ যার সহযোগী হয় না। ধরে নেয়া যাক, "ওয়াদিউন নাম্‌ল" বলতে যদি ঐ উপত্যকা মনে করা হয় এবং সেখানে বনী নাম্‌ল নামে কোন গোত্র বাস করতো বলে যদি ধরে নেয়া যায়, তাহলেও নাম্‌ল গোত্রের এক ব্যক্তিকে "নাম্‌লাহ" বলা আরবী ভাষার বাকরীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যদিও পশুদের নামে আরবে বহু গোত্রের নাম রয়েছে, যেমন কাল্‌ব (কুকুর), আসাদ (সিংহ) ইত্যাদি কিন্তু কোন আরববাসী কাল্‌ব গোত্রের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে قَالَ كَلْبٌ (একজন কুকুর একথা বললো) এবং আসাদ গোত্রের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে قَالَ اَسَدٌ (একজন সিংহ বললো) কখনো বলবে না। তাই বনী নাম্‌লের এক ব্যক্তি সম্পর্কে এভাবে বলা, قَالَتْ نَمْلَةٌ (একজন পিঁপড়ে একথা বললো) পুরোপুরি আরবী বাগ্‌ধারা ও আরবী বাক্য প্রয়োগ রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারপর নাম্‌ল গোত্রের এক ব্যক্তির বনী নাম্‌লকে চিৎকার করে একথা বলা, "হে নাম্‌ল গোত্রীয় লোকেরা! নিজ নিজ গৃহে ঢুকে পড়ো। এমন যেন না হয়, সুলাইমানের সৈন্যরা তোমাদের পিষে ফেলবে এবং তারা জানতেও পারবে না," একেবারেই অর্থহীন। কারণ মানুষের কোন সেনাদল মানুষের কোন দলকে অজ্ঞাতসারে পদদলিত করে না। যদি তারা তাদেরকে

আক্রমণ করার সংকল্প নিয়ে এসে থাকে, তাহলে তাদের নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়া অর্থহীন। আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে ঢুকে ভালোভাবে তাদেরকে কচুকাটা করবে। আর যদি তারা নিছক কুচকাওয়াজ করতে করতে অতিক্রম করে থাকে, তাহলে তো তাদের জন্য শুধুমাত্র পথ ছেড়ে দেয়াই যথেষ্ট। কুচকাওয়াজকারীদের আওতায় এলে মানুষের ক্ষতি অবশ্যই হতে পারে কিন্তু চলাচলকারী মানুষ অজ্ঞাতসারে মানুষকে দলে পিষে রেখে যাবে এমনটি তো হতে পারে না। কাজেই বনী নাম্‌ল যদি কোন মানবিক গোত্র হতো এবং তাদের কোন ব্যক্তি নিজের গোত্রকে সতর্ক করতে চাইতো, তাহলে আক্রান্ত হবার আশংকার প্রেক্ষিতে সে বলতো, "হে নাম্‌ল গোত্রীয়রা! পালাও; পালাও; পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় নাও, যাতে সুলাইমানের সৈন্যরা তোমাদের ধ্বংস করে না দেয়।" আর আক্রমণের আশংকা না থাকলে সে বলতো, "হে নাম্‌ল গোত্রীয়রা! পথ থেকে সরে যাও, যাতে তোমাদের কেউ সুলায়মানের সেনাদলের সামনে না পড়ে।"

এ পেঁচালো ব্যাখ্যার মধ্যে আরবী ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তো এ ভুল ছিল। এখন নাম্‌ল উপত্যকা এবং সেখানে বনী নাম্‌ল নামক একটি গোত্রের বাস সম্পর্কে বলা যায়, এটি আসলে একটি কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনে আদৌ কোন তাত্বিক প্রমাণ নেই। যারা একে উপত্যকার নাম বলেছেন তারা নিজেরাই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পিঁপড়ের আধিক্যের কারণে একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, واد بارض الشام كثير النمل "সেটি সিরিয়া দেশের একটি উপত্যকা এবং সেখানে পিঁপড়ের আধিক্য রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস ও ভূগোলের কোন বইতে এবং পুরাতত্ত্বের কোন গবেষণায়ও এ উপত্যকায় বনী নাম্‌ল নামক কোন উপজাতির কথা উল্লেখিত হয়নি। এটি নিছক একটি মনগড়া কথা। নিজেদের কল্পিত ব্যাখ্যাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য এটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহেও এ কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু তার শেষাংশ কুরআনের বর্ণনার বিপরীত এবং হযরত সুলাইমানের মর্যদারও বিরোধী। সেখানে বলা হয়েছে, হযরত সুলাইমান যখন এমন একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন যেখানে খুব বেশী পিঁপড়ে ছিল তখন তিনি শুনলেন একটি পিঁপড়ে চিৎকার করে অন্য পিঁপড়েদেরকে বলছে, "নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ো, নয়তো সুলাইমানের সৈন্যরা তোমাদের পিষে ফেলবে।" একথা শুনে হযরত সুলাইমান (আ) সেই পিঁপড়ের সামনে বড়ই আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করলেন। এর জবাবে পিঁপড়েটি তাকে বললো, তুমি কোথাকার কে? তুমি তো নগণ্য একটি ফোঁটা থেকে তৈরী হয়েছো। একথা শুনে সুলাইমান লজ্জিত হলেন। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়া ১১ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা) এথেকে অনুমান করা যায়, কুরআন কিভাবে বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহ সংশোধন করেছে এবং তারা নিজেদের নবীদের চরিত্রে যেসব কলংক লেপন করেছিল কিভাবে সেগুলো দূর করেছে। এসব বর্ণনা থেকে কুরআন সবকিছু চুরি করেছে বলে পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা নির্লজ্জভাবে দাবী করে।

একটি পিঁপড়ের পক্ষে নিজের সমাজের সদস্যদেরকে কোন একটি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া এবং এ জন্য তাদের নিজেদের গর্তে ঢুকে যেতে বলা

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোটেই কোন অস্বাভবিক ব্যাপার নয়। এখন হযরত সুলাইমান একথাটি কেমন করে শুনতে পেলেন এ প্রশ্ন থেকে যায়। এর জবাবে বলা যায়, যে ব্যক্তির শ্রবনেন্দ্রিয় আল্লাহর কালামের মতো সূক্ষ্মতর জিনিস আহরণ করতে পারে তার পক্ষে পিঁপড়ের কথার মতো স্থূল (Crude) জিনিস আহরণ করা কোন কঠিন ব্যাপার হতে যাবে কেন।

২৫. মূল শব্দ হচ্ছে رَبِّ اَوْزِعْنِىْ এখানে আরবী ভাষায় وزع এর আসল অর্থ হচ্ছে রুখে দেয়া। এ সময় হযরত সুলাইমানের একথা বলা اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ (আমাকে রুখে দাও, আমি তোমার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো)। আমাদের কাছে আসলে এ অর্থ প্রকাশ করে যে, হে আমার রব! তুমি আমাকে যে বিরাট শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছো তা এমন যে, যদি আমি সামান্য গাফিল হয়ে যাই তাহলে নাজানি বন্দেগীর সীমানা থেকে বের হয়ে আমি নিজের অহংকারে মত্ত হয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাই। তাই হে আমার পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, যাতে আমি অনুগ্রহ অস্বীকারকারীর পরিবর্তে অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীতে পরিণত হতে পারি।

২৬. সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করার অর্থ সম্ভবত এ হবে যে, আখেরাতে আমার পরিণতি যেন সৎকর্মশীল লোকদের সাথে হয় এবং আমি যেন তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। কারণ মানুষ যখন সৎকাজ করবে তখন সৎকর্মশীল তো সে আপনা আপনিই হয়ে যাবে। তবে আখেরাতে কারো জান্নাতে প্রবেশ করা নিছক তার সৎকর্মের ভিত্তিতে হতে পারে না বরং এটি আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভর করে। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لن يدخل احدكم الجنة عمله "তোমাদের কারো নিছক আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না।" বলা হলো, ولا انت يا رسول الله "আপনার বেলায়ও কি একথা খাটে?" জবাব দিলেন, ولا انا الا ان يتغمدنى الله تعالى برحمته "হ্যাঁ, আমিও নিছক আমার আমলের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেবেন।"

যদি 'আন নাম্‌ল, মানে হয় মানুষদের একটি উপজাতি এবং 'নাম্‌লাহ' মানে হয় নাম্‌ল উপজাতির এক ব্যক্তি তাহলে সুলাইমান আলাইহিস সালামের এ দোয়া এ সময় একেবারেই নিরর্থক হয়ে যায়। এক বাদশাহর পরাক্রমশালী সেনাবাহিনীর ভয়ে কোন মানবিক গোত্রের এক ব্যক্তির নিজের গোত্রকে বিপদ সম্পর্কে সজাগ করা এমন কোন্ ধরনের অস্বাভাবিক কথা যে, এমন একজন সুমহান মর্যাদাশালী পরাক্রান্ত বাদশাহ এ জন্য আল্লাহর কাছে এ দোয়া চাইবেন। তবে এক ব্যক্তির দূর থেকে একটু পিঁপড়ের আওয়াজ শুনার এবং তার অর্থ বুঝার মতো জবরদস্ত শ্রবণ ও জ্ঞান শক্তির অধিকারী হওয়াটা অবশ্যই এমন একটি বিষয় যার ফলে মানুষের আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ ধরনের অবস্থায় হযরত সুলাইমানের এ দোয়া যথার্থ ও যথাযথ।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢١﴾

(আর একবার) সুলাইমান পাখিদের খোঁজ-খবর নিল[২৭] এবং বললো, "কি ব্যাপার, আমি অমুক হুদ্‌হুদ পাখিটিকে দেখছিনা যে! সে কি কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে? আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা জবাই করে ফেলবো, নয়তো তাকে আমার কাছে যুক্তিসংগত কারণ দর্শাতে হবে।"[২৮]

২৭. অর্থাৎ এমনসব পাখিদের খোঁজ-খবর যাদের সম্পর্কে ওপরে বলা হয়েছে যে, জিন ও মানুষের মতো তাদের সেনাদলও হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অন্তরভুক্ত ছিল। সম্ভবত হযরত সুলাইমান তাদের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান, শিকার এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন।

২৮. বর্তমান যুগের কোন কোন লোকও বলেন, আরবী ও আমাদের দেশীয় ভাষায় যে পাখিটিকে হুদ্‌হুদ পাখি বলা হয় হুদ্‌হুদ বলে আসলে সে পাখিটিকে বুঝানো হয়নি। বরং এটি এক ব্যক্তির নাম। সে ছিল হযরত সুলাইমানের (আ) সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। এ দাবীর ভিত্তি এ নয় যে, ইতিহাসে তারা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সেনাবাহিনীতে হুদ্‌হুদ নামে একজন অফিসারের সন্ধান পেয়েছেন। বরং শুধুমাত্র এ যুক্তির ভিত্তিতে এ দাবী খাড়া করা হয়েছে যে, প্রাণীদের নামে মানুষের নামকরণ করার রীতি দুনিয়ার সকল ভাষার মতো আরবীতেও প্রচলিত আছে এবং হিব্রু ভাষাতেও ছিল। তাছাড়া সামনের দিকে হুদ্‌হুদের যে কাজ বর্ণনা করা হয়েছে এবং হযরত সুলাইমানের (আ) সাথে তার যে কথাবার্তা উল্লেখিত হয়েছে তা তাদের মতে একমাত্র একজন মানুষই করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের পূর্বাপর আলোচনা দেখলে মানুষ পরিষ্কার জানতে পারে যে, এটা কুরআনের তাফসীর নয় বরং তার বিকৃতি এবং এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে বলা যায়, তার প্রতি মিথ্যাচারিতা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সাথে কুরআনের কি কোন শত্রুতা আছে? সে বলতে চায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সেনাবাহনী বা পল্টন অথবা তথ্য বিভাগের একব্যক্তি অনুপস্থিত ছিল। তিনি তার খোঁজ করছিলেন। সে হাজির হয়ে এই এই খবর দিল। হযরত সুলাইমান তাকে এই এই কাজে পাঠালেন। একথাটা বলতে গিয়ে কুরআন অনবরত এমন হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করছে যা পাঠ করে একজন পাঠক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে পাখিই মনে করতে বাধ্য হচ্ছে। এ প্রসংগে কুরআনের বর্ণনা বিন্যাসের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন ঃ

প্রথমে বলা হয়, হযরত সুলাইমান আল্লাহর এ অনুগ্রহের জন্য এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, "আমাকে পাখির ভাষার জ্ঞান দেয়া হয়েছে" এ বাক্যে তো প্রথমত পাখি শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফলে প্রত্যেকটি আরব ও আরবী জানা লোক এ শব্দটিকে পাখি অর্থে গ্রহণ করবে। কারণ এখানে এমন কোন পূর্বাপর প্রসংগ বা সম্পর্ক নেই যা এ শব্দটিকে রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করার পথ সুগম করতে পারে।

দ্বিতীয়ত এ মূলে ব্যবহৃত "তাইর" শব্দের অর্থ পাখি না হয়ে যদি মানুষের কোন দল হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য "মান্‌তিক" (বুলি) শব্দ না বলে "লুগাত" বা "লিসান" (অর্থাৎ ভাষা) শব্দ বলা বেশী সঠিক হতো। আর তাছাড়া কোন ব্যক্তির অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর ভাষা জানাটা এমন কোন বিরাট ব্যাপার নয় যে, বিশেষভাবে সে তার উল্লেখ করবে। আজকাল আমাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক অনেক বিদেশী ভাষা জানে ও বোঝে। এটা এমন কি কৃতিত্ব যে জন্য একে মহান আল্লাহর অস্বাভাবিক দান ও অনুগ্রহ গণ্য করা যেতে পারে?

এরপর বলা হয়, "সুলাইমানের জন্য জিন, মানুষ ও পাখি সেনাদল সমবেত করা হয়েছিল।" এ বাক্যে প্রথমত জিন, মানুষ ও পাখি তিনটি পরিচিত জাতির নাম ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ তিনটি শব্দ তিনটি বিভিন্ন ও সর্বজন পরিচিত জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারপর এ শব্দগুলো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এদের কোনটির রূপক ও অপ্রকৃত অর্থে বা উপমা হিসেবে ব্যবহারের সপক্ষে কোন পূর্বাপর প্রাসংগিক সূত্রও নেই। ফলে ভাষার পরিচিত অর্থগুলোর পরিবর্তে অন্য অর্থে কোন ব্যক্তি এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া "মানুষ" শব্দটি "জিন" ও "পাখি'' শব্দ দু'টির মাঝখানে বসেছে, যার ফলে জিন ও পাখি আসলে মানুষ প্রজাতিরই দু'টি দল ছিল এ অর্থ গ্রহণ করার পথে সুস্পষ্ট বাধার সৃষ্টি হয়েছে। যদি এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হতো তাহলে من الجن والانس والطير না বলে বলা হতো الجن والطير من الانس –

সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বলা হয়, হযরত সুলাইমান পাখির খোঁজ খবর নিচ্ছেলেন। এ সময় হুদ্‌হুদকে অনুপস্থিত দেখে তিনি একথা বলেন। যদি এ পাখি মানুষ হয়ে থাকে এবং হুদ্‌হুদও কোন মানুষের নাম হয়ে থাকে তাহলে কমপক্ষে তিনি এমন কোন শব্দ বলতেন যা থেকে বেচারা পাঠক তাকে প্রাণী মনে করতো না। দলের নাম বলা হচ্ছে পাখি এবং তার একজন সদস্যের নাম বলা হচ্ছে হুদ্‌হুদ, এরপরও আমরা স্বতস্ফূর্তভাবে তাকে মানুষ মনে করে নেব, আমাদের কাছে এ আশা করা হচ্ছে।

তারপর হযরত সুলাইমান বলেন, হুদহুদ হয় তার নিজের অনুপস্থিত থাকার যুক্তি সংগত কারণ বলবে আর নয়তো আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা জবাই করে ফেলবো। মানুষকে হত্যা করা হয়, ফাঁসি দেয়া হয়, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, জবাই করে কে? কোন ভয়ংকর পাষাণ হৃদয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগল হয়ে গেলে হয়তো কাউকে জবাই করে ফেলে। কিন্তু আল্লাহর নবীর কাছেও কি আমরা এ আশা করবো যে, তিনি নিজের সেনাদলের এক সদস্যকে নিছক তার গরহাজির (Deserter) থাকার অপরাধে জবাই করার কথা ঘোষণা করে দেবেন এবং আল্লাহর প্রতি এ সুধারণা পোষণ করবো যে, তিনি এ ধরনের একটি মারাত্মক কথার উল্লেখ করে তার নিন্দায় একটি শব্দও বলবেন না?

আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, হযরত সুলাইমান এ হুদ্‌হুদের কাছে সাবার রাণীর নামে পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছেন এবং সেটি তাদের কাছে ফেলে দিতে বা নিক্ষেপ করতে বলছেন (القه اليهم) । বলা নিষ্প্রয়োজন, এ নির্দেশ পাখিদের প্রতি দেয়া যেতে পারে কিন্তু কোন মানুষকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে তাকে এ ধরনের নিক্ষেপ

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾

কিছুক্ষণ অতিবাহিত না হতেই সে এসে বললো, "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনি জানেন না। আমি সাবা সম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।[২৯] *আমি সেখানে এক মহিলাকে সে জাতির শাসকরূপে দেখেছি। তাকে সবরকম সাজ সরঞ্জাম দান করা হয়েছে এবং তার সিংহাসন খুবই জমকালো।*

করার নির্দেশ দেয়া একেবারে অসংগত হয়। কেউ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে সে একথা মেনে নেবে যে, এক দেশের বাদশাহ অন্য দেশের রাণীর নামে পত্র দিয়ে নিজের রাষ্ট্রদূতকে এ ধরনের নির্দেশ সহকারে পাঠাতে পারে যে, পত্রটি নিয়ে রাণীর সামনে ফেলে দাও বা নিক্ষেপ করো। আমাদের মতো মামুলি লোকেরাও নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে নিজের কোন কর্মচারীকে পাঠাবার ক্ষেত্রেও ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের যে প্রাথমিক রীতি মেনে চলি হযরত সুলাইমানকে কি তার চেয়েও নিম্নমানের মনে করতে হবে? কোন ভদ্রলোক কি কখনো নিজের কর্মচারীকে বলতে পারে, যা আমার এ পত্রটি অমুক সাহেবের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে আয়?

এসব নিদর্শন ও চিহ্ন পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, এখানে হুদ্‌হুদ আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে মানুষ নয় বরং একটি পাখি ছিল। এখন যদি কোন ব্যক্তি একথা মেনে নিতে প্রস্তুত না হয় যে, কুরআন হুদ্‌হুদের বলা যেসব কথা উদ্ধৃত করছে একটি হুদ্‌হুদ তা বলতে পারে, তাহলে তার পরিষ্কার বলে দেয়া উচিত আমি কুরআনে এ কথাটি মানি না। কুরআনের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শব্দগুলোর মনগড়া অর্থ করে তার আড়ালে নিজের অবিশ্বাসকে লুকিয়ে রাখা জঘন্য মুনাফিকী ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৯. সাবা ছিল আরবের দক্ষিণ এলাকার একটি বিখ্যাত ব্যবসাজীবী জাতি। তাদের রাজধানী মারিব বর্তমান ইয়ামনের রাজধানী সান্‌আ থেকে ৫৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল। তাঁর উত্থানের যুগ মাঈনের রাষ্ট্রের পতনের পর প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দে শুরু হয়। এরপর থেকে প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত। আরব দেশে তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ অব্যাহত থাকে। তারপর ১১৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ আরবের দ্বিতীয় খ্যাতিমান জাতি হিম্‌য়ার তাদের স্থান দখল করে। আরবে ইয়ামন ও হাদরামউত এবং আফ্রিকায় হাবৃশা (ইথিয়োপিয়া) পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পূর্ব আফ্রিকা, হিন্দুস্তান, দূর প্রাচ্য এবং আরবের যত বাণিজ্য মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও ইতালীর সাথে হতো তার বেশীর ভাগ ছিল এ সাবায়ীদের হাতে। এ জন্য এ জাতিটি প্রাচীনকালে নিজের ধনাঢ্যতা ও সম্পদশালীতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বরং গ্রীক ঐতিহাসিকরা তো তাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যবসায় ছাড়া তাদের সমৃদ্ধির বড় কারণটি ছিল এই যে, তারা

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ (সজদা)

আমি তাকে ও তার জাতিকে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সামনে সিজ্‌দা করতে দেখেছি"[৩০] —শয়তান[৩১] তাদের কার্যাবলী তাদের জন্য শোভন করে দিয়েছে[৩২] এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে এ কারণে তারা সোজা পথ পায় না। (শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করেছে এ জন্য) যাতে তারা সেই আল্লাহকে সিজ্‌দা না করে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন জিনিসসমূহ বের করেন[৩৩] এবং সে সবকিছু জানেন যা তোমরা গোপন করো ও প্রকাশ করো।[৩৪] আল্লাহ, ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের হকদার নয় তিনি মহান আরশের মালিক।[৩৫]

দেশের জায়গায় জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ফলে তাদের সমগ্র এলাকা সবুজ শ্যামল উদ্যানে পরিণত হয়েছিল। তাদের দেশের এ অস্বাভাবিক শস্য শ্যামলিমার কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও উল্লেখ করেছেন এবং কুরআন মজীদও সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তে এদিকে ইংগিত করেছে।

হুদ্‌হুদের একথা, "আমি এমন তথ্য সংগ্রহ করেছি যা আপনি জানেন না" বলার অর্থ এ নয় যে, হযরত সুলাইমান সাবার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। একথা সুস্পষ্ট ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার যে শাসকের রাজ্য লোহিত সাগরের উত্তর তীর (আকাবা উপসাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তিনি সেই লোহিত সাগরের দক্ষিণ কিনারে (ইয়ামন) বসবাসরত এমন একটি জাতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকতে পারেন না যারা আন্তরজাতিক বাণিজ্য পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। তাছাড়া যাবুর থেকে জানা যায়, হযরত সুলাইমানেরও পূর্বে তাঁর মহান পিতা হযরত দাউদ (আ) সাবা সম্পর্কে জানতেন। যাবুরে আমরা তার দোয়ার এ শব্দগুলো পাই ঃ

> "হে ইশ্বর, তুমি রাজাকে (অর্থাৎ স্বয়ং হযরত দাউদকে) আপনার শাসন, রাজপুত্রকে (অর্থাৎ সুলাইমানকে) আপনার ধর্মশীলতা প্রদান কর.....................। তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন। শিবা (অর্থাৎ সাবার ইয়ামনী ও হাবশী শাখাসমূহ) সাবার রাজগণ উপহার দিবেন।" (গীত সংহিতা ৭২ ঃ ১–২, ১০–১১)

তাই হুদ্‌হুদের কথার অর্থ মনে হয় এই যে, সাবা জাতির কেন্দ্রস্থলে আমি স্বচক্ষে যা দেখে এসেছি তার কোন খবর এখনো পর্যন্ত আপনার কাছে পৌছেনি।

৩০. এ থেকে জানা যায়, সেকালে এ জাতিটি সূর্য দেবতার পূজা করতো। আরবের প্রাচীন বর্ণনাগুলো থেকেও এ জাতির এ একই ধর্মের কথা জানা যায়। ইবনে ইসহাক কুলজি বিজ্ঞান (Genealogies) অভিজ্ঞদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, সাবা জাতির প্রাচীনতম পূর্ব পুরুষ হলো আব্‌দে শাম্‌স (অর্থাৎ সূর্যের দাস বা সূর্য উপাসক) এবং উপাধি ছিল সাবা। বনী ইসরাঈলের বর্ণনাও এর সমর্থক। সেখানে বলা হয়েছে, হুদ্‌হুদ যখন হযরত সুলাইমানের (আ) পত্র নিয়ে পৌঁছে যায় সাবার রাণী তখন সূর্য দেবতার পূজা করতে যাচ্ছিলেন। হুদ্‌হুদ পথেই পত্রটি রাণীর সামনে ফেলে দেয়।

৩১. বক্তব্যের ধরন থেকে অনুমিত হয় যে, এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্তকার বাক্যগুলো হুদ্‌হুদের বক্তব্যের অংশ নয়। বরং "সূর্যের সামনে সিজদা করে" পর্যন্ত তার বক্তব্য শেষ হয়ে যায়। এরপর এ উক্তিগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এ অনুমানকে যে জিনিস শক্তিশালী করে তা হচ্ছে এ বাক্যটি وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ "আর তিনি সবকিছু জানেন, যা তোমরা লুকাও ও প্রকাশ করো।" এ শব্দগুলো থেকে প্রবল ধারণা জন্মে যে, বক্তা হুদ্‌হুদ এবং শ্রোতা হযরত সুলাইমান ও তার দরবারীগণ নন বরং বক্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি সম্বোধন করছেন মক্কার মুশরিকদেরকে, যাদেরকে নসিহত করার জন্যই এ কাহিনী শুনানো হচ্ছে। মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে রূহুল মা'আনী–এর লেখক আল্লামা আলূসীও এ অনুমানকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ার ধন–সম্পদ উপার্জন এবং নিজের জীবনকে অত্যধিক জাঁকালো ও বিলাসী করার যে কাজে তারা নিমগ্ন ছিল, শয়তান তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, বুদ্ধি ও চিন্তার এটিই একমাত্র নিয়োগ ক্ষেত্র এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ প্রয়োগের একমাত্র উপযুক্ত স্থান। তাই এ পার্থিব জীবন ও তার আরাম আয়েশ ছাড়া আর কোন জিনিস সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করার দরকার নেই। এ আপাতদৃষ্ট পার্থিব জীবনের পিছনে কোন্ বাস্তব সত্য নিহিত রয়েছে এবং তোমাদের প্রচলিত ধর্ম, নৈতিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ এ সত্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, না পুরোপুরি তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে— সেসব নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবার দরকার নেই বলে শয়তান তাদেরকে নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, তোমরা যখন ধন–দৌলত, শক্তি–সামর্থ ও শান–শওকতের দিক দিয়ে দুনিয়ায় অগ্রসর হয়েই যাচ্ছো তখন আবার তোমাদের প্রচলিত আকিদা–বিশ্বাস ও মতবাদকে সঠিক কিনা, তা চিন্তা করার প্রয়োজনই বা কি। এসব সঠিক হবার সপক্ষে তো এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট যে, তোমরা আরামে ও নিশ্চিন্তে অর্থ ও বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলছ। এবং আয়েশী জীবন যাপন করছো।

৩৩. যিনি প্রতিমুহূর্তে এমন সব জিনিসের উদ্ভব ঘটাচ্ছেন যেগুলো জন্মের পূর্বে কোথায় কোথায় লুকিয়ে ছিল কেউ জনে না। ভূ–গর্ভ থেকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য উদ্ভিদ এবং নানা ধরনের খনিজ পদার্থ বের করছেন। উর্ধ জগত থেকে প্রতিনিয়ত এমন সব জিনিসের আবির্ভাব ঘটাচ্ছেন, যার আবির্ভাব না ঘটলে মানুষের ধারণা ও কল্পনায়ও কোনদিন আসতে পারতো না।

৩৪. অর্থাৎ সকল জিনিসই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। তাঁর কাছে গোপন ও প্রকাশ্য সব সমান। সবকিছুই তার সামনে সমুজ্জ্বল ও উন্মুক্ত।

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ
هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا
الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

সুলাইমান বললো, "এখনই আমি দেখছি তুমি সত্য বলছো অথবা মিথ্যাবাদীদের অন্তরভুক্ত। আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং এটি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করো, তারপর সরে থেকে দেখো তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়।"৩৬

রাণী বললো, "হে দরবারীরা! আমার প্রতি একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। তা সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে শুরু করা হয়েছে।" বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ "আমার অবাধ্য হয়ো না এবং মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হয়ে যাও।"৩৭

নমুনা হিসেবে মহান আল্লাহর এ দু'টি গুণ বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, যদি তারা শয়তানের প্রতারণা জালে আবদ্ধ না হতো তাহলে এ সোজা পথটি পরিষ্কার দেখতে পেতো যে, সূর্যনামের একটি জ্বলন্ত জড় পদার্থ, যার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই কোন অনুভূতি নেই, সে কোন ইবাদাতের হকদার নয় বরং একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী মহান সত্তা যাঁর অসীম শক্তি প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন অভাবনীয় কৃর্তির উদ্ভব ঘটাচ্ছে, তিনিই এর হকদার।

৩৫. এখানে সিজদা করা ওয়াজিব। কুরআনের যেসব জায়গায় সিজদা করা ওয়াজিব বলে ফকীহগণ একমত, এটি তার অন্যতম । এখানে সিজদা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন মু'মিনের সূর্যপূজারীদের থেকে নিজেকে সচেতনভাবে পৃথক করা এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে একথার স্বীকৃতি দেয়া ও একথা প্রকাশ করা উচিত যে, সে সূর্যকে নয় বরং একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকেই নিজের সিজদার ও ইবাদাতের উপযোগী এবং যোগ্য মনে করে।

৩৬. এখানে এসে হুদ্‌হুদের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়। যুক্তিবাদের প্রবক্তারা যে কারণে তাকে পাখি বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে সেটি হচ্ছে এই যে, তাদের মতে একটি পাখি এতটা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা ও বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সে একটা দেশের ওপর দিয়ে উড়ে য়াওয়ার সময় বুঝে ফেলবে যে, এটি সাবা জাতির দেশ, এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ ধরনের, এর শাসক অমুক মহিলা, এদের ধর্ম সূর্যপূজা, এদের এক আল্লাহর পূজারী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এরা ভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে ইত্যাদি, আর সে এসে হযরত সুলাইমানের সামনে নিজের এসব উপলব্ধি এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এটা

তাদের দৃষ্টিতে একটি অসম্ভব ব্যাপার। এসব কারণে কট্টর নাস্তিকরা কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপন করে বলে, কুরআন "কালীলাহ ও দিমনা" (পশু পাখির মুখ দিয়ে বর্ণিত উপদেশমূলক কল্পকাহিনী) ধরনের কথাবার্তা বলে। আর কুরআনের যুক্তিবাদী তাফসীর যারা করেন তারা তার শব্দগুলোকে তাদের প্রত্যক্ষ অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এই হুদ্‌হুদ তো আসলে কোন পাখিই ছিল না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এ ভদ্র মহোদয়গণের কাছে এমন কি বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী আছে যার ভিত্তিতে তারা চূড়ান্তভাবে একথা বলতে পারেন যে, পশু পাখি ও তাদের বিভিন্ন প্রজাতি এবং বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট পাখির শক্তি, দক্ষতা, নৈপুন্য, ও ধীশক্তি কতটুকু এবং কতটুকু নয়? যে জিনিসগুলোকে তারা অর্জিত জ্ঞান মনে করছেন সেগুলো আসলে প্রাণীদের জীবন ও আচার আচরণের নিছক অকিঞ্চিত ও ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণ ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা কে কি জানে, শোনে ও দেখে, কি অনুভব করে, কি চিন্তা করে ও বোঝে এবং তাদের প্রত্যেকের মন ও বুদ্ধিশক্তি কিভাবে কাজ করে, এসব সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত কোন নিশ্চিত উপায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। এরপরও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জীবনের যে সামান্যতম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে তাদের বিস্ময়কর যোগ্যতা ও ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন মহান আল্লাহ যিনি এসব প্রাণীর স্রষ্টা তিনি যদি আমাদের বলেন, তিনি তাঁর একজন নবীকে এসব প্রাণীর ভাষা বুঝার এবং এদের সাথে কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলেন এবং সেই নবীর কাছে প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবার কারণে একটি হুদ্‌হুদ পাখি এমনি যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছিল যার ফলে ভিন দেশ থেকে এই এই বিষয় দেখে এসে নবীকে সে তার খবর দিতো, তাহলে আল্লাহর এ বর্ণনার আলোকে আমাদের কি প্রাণীজগত সম্পর্কে নিজেদের এ পর্যন্তকার যৎসামান্য জ্ঞান ও বিপুল সংখ্যক অনুমানের পুনরবিবেচনা করা উচিত ছিল না? তা না করে নিজেদের এ অকিঞ্চিত জ্ঞানকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে আল্লাহর এ বর্ণনার প্রতি মিথ্যা আরোপ অথবা তার মধ্যে সূক্ষ্ম অর্থগত বিকৃতি সাধন করা আমাদের কোন্ ধরনের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক?

৩৭. অর্থাৎ কয়েকটি কারণে পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। এক, পত্রটি এসেছে অদ্ভূত ও অস্বাভিক পথে। কোন রাষ্ট্রদূত এসে পত্র দেয়নি। বরং তার পরিবর্তে এসেছে একটি পাখি। সে পত্রটি আমার কাছে ফেলে দিয়েছে। দুই, পত্রটি হচ্ছে, ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার মহান শাসক সুলাইমানের (আ) পক্ষ থেকে। তিন, এটি শুরু করা হয়েছে আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে। অথচ দুনিয়ার কোথাও চিঠিপত্র লেখার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। তারপর সকল দেবতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহর নামে পত্র লেখাও আমাদের দুনিয়ায় একটি অস্বাভাবিক ও অভিনব ব্যাপার। সর্বোপরি যে বিষয়টি এর গুরুত্ব আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, পত্রে আমাকে একেবারে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাওয়াত দেয়া হয়েছে, আমি যেন অবাধ্যতার পথ পরিহার করে আনুগত্যের পথ অবলম্বন করি এবং হুকুমের অনুগত বা মুসলমান হয়ে সুলাইমানের সামনে হাজির হয়ে যাই।

"মুসলিম" হয়ে হাজির হবার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, অনুগত হয়ে হাজির হয়ে যাও। দুই, দীন ইসলাম গ্রহণ করে হাজির হয়ে যাও। প্রথম হুকুমটি হযরত সুলাইমানের

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ۝ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ۝ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝

৩ রুকূ'

(পত্র শুনিয়ে) রাণী বললো, "হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমার উদ্ভূত সমস্যায় তোমরা পরামর্শ দাও। তোমাদের বাদ দিয়ে তো আমি কোন বিষয়ের ফায়সালা করি না।[৩৮] *তারা জবাব দিল, "আমরা শক্তিশালী ও যোদ্ধা জাতি, তবে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন আপনার কি আদেশ দেয়া উচিত। রাণী বললো, কোন বাদশাহ যখন কোন দেশে ঢুকে পড়ে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার মর্যাদাশালীদেরকে লাঞ্ছিত করে*[৩৯] *এ রকম কাজ করাই তাদের রীতি।*[৪০] *আমি তাদের কাছে একটি উপঢৌকন পাঠাচ্ছি তারপর দেখছি আমার দূত কি জবাব নিয়ে ফেরে।"*

শাসকসুলভ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। দ্বিতীয় হুকুমটি সামঞ্জস্য রাখে তাঁর নবীসুলভ মর্যাদার সাথে। সম্ভবত এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পত্রে উভয় উদ্দেশ্য অন্তরভুক্ত থাকার কারণে। ইসলামের পক্ষ থেকে স্বাধীন জাতি ও সরকারদেরকে সবসময় এ মর্মে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সত্য দীন গ্রহণ করো এবং আমাদের সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সমান অংশীদার হয়ে যাও অথবা নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অধীনতা গ্রহণ করো এবং নিসংকোচে জিযিয়া দাও।

৩৮. মূল শব্দ হচ্ছে حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ –যতক্ষণ না তোমরা উপস্থিত হও অথবা তোমরা সাক্ষী না হও। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ফায়সালা করার সময় আমার নিকট তোমাদের উপস্থিতি জরুরী হয়ে পড়ে। তাছাড়া আমি যে ফায়সালাই করি না কেন তার সঠিক হবার ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষ দিতে হয়। এ থেকে যে কথা প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে এই যে, সাবা জাতির মধ্যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও তা কোন স্বৈরতান্ত্রিক মেজাজের ছিল না বরং তদানীন্তন শাসনকর্তা রাষ্ট্রের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করতেন।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ
بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ
لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا
اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ
مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ
لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾

যখন সে (রাণীর দূত) সুলাইমানের কাছে পৌঁছুলো, সে বললো, "তোমরা কি অর্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী।[৪১] তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই খুশী থাকো। (হে দূত!) ফিরে যাও নিজের প্রেরণকারীদের কাছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সেনাদল নিয়ে আসবো[৪২] যাদের তারা মোকাবিলা করতে পারবে না এবং আমি তাদেরকে এমন লাঞ্ছিত করে সেখান থেকে বিতাড়িত করবো যে, তারা ধিকৃত ও অপমাণিত হবে।"

সুলাইমান বললো,[৪৩] "হে সভাসদগণ! তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে?"[৪৪] এক বিশালকায় জিন বললো, আপনি নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেবো।[৪৫] আমি এ শক্তি রাখি এবং আমি বিশ্বস্ত।[৪৬]

৩৯. এ একটি বাক্যের মাধ্যমে রাজতন্ত্র এবং তার প্রভাব ও ফলাফলের ওপর পূর্ণাংগ মন্তব্য করা হয়েছে। রাজ–রাজড়াদের দেশ জয় এবং বিজেতা জাতি কর্তৃক অন্য জাতির ওপর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব কখনো সংশোধন ও মংগলাকাংখ্যার উদ্দেশ্যে হয় না। এর উদ্দেশ্য হয়, অন্য জাতিকে আল্লাহ যে রিযিক এবং উপায় উপকরণ দিয়েছেন তা থেকে নিজেরা লাভবান হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট জাতিকে এতটা ক্ষমতাহীন করে দেয়া যার ফলে সে আর কখনো মাথা উঁচু করে নিজের অংশটুকু চাইতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে সে তার সমৃদ্ধি, শক্তি ও মর্যাদার যাবতীয় উপায়–উপকরণ খতম করে দেয়। তার যেসব লোকের মধ্যে আত্ম–মর্যাদাবোধের লেশমাত্র সঞ্জীবিত থাকে তাদেরকে দলিত মথিত করে। তার লোকদের মধ্যে তোষামোদ প্রিয়তা পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি, একে অন্যের গোয়েন্দাগিরি করা, বিজয়ী শক্তির অন্ধ অনুকরণ করা, নিজের সভ্যতা–সংস্কৃতিকে হেয়

মনে করা, হানাদারদের সভ্যতা–সংস্কৃতিকে গোলামী দান করা এবং এমনিতর অন্যান্য নীচ ও ঘৃণিত গুণাবলী সৃষ্টি করে দেয়। এ সংগে তাদেরকে এমন স্বভাবের অধিকারী করে তোলে যার ফলে তারা নিজেদের পবিত্রতম জিনিসও বিক্রি করে দিতে ইতস্তত করে না এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যাবতীয় ঘৃণিত কাজ করে দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।

৪০. এ বাক্যাংশের বক্তা কে, সে ব্যাপারে দু'টি সমান সমান সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হচ্ছে, এটি সাবার রাণীরই উক্তি এবং তিনি তাঁর পূর্বের উক্তিটির ওপর জোর দিয়ে এটুকু সংযোজন করেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হচ্ছে, এটি মহান আল্লাহরই উক্তি। রাণীর বক্তব্য সমর্থন করার জন্য প্রাসংগিক বাক্য হিসেবে তিনি একথা বলেন।

৪১. অহংকার ও দাম্ভীকতার প্রকাশ এ কাজের উদ্দেশ্য নয়। আসল বক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের অর্থ–সম্পদ আমার লক্ষ নয় বরং তোমরা ঈমান আনো এটাই আমার কাম্য। অথবা কমপক্ষে যে জিনিস আমি চাই তা হচ্ছে, তোমরা একটি সৎজীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। এ দু'টি জিনিসের মধ্যে কোন একটিই যদি তোমরা না চাও, তাহলে ধন-সম্পদের উৎকোচ গ্রহণ করে তোমাদেরকে এই শির্‌ক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নোংরা জীবন ব্যবস্থার ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাদের সম্পদের তুলনায় আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা ঢের বেশী। কাজেই তোমাদের সম্পদের প্রতি আমার লোভাতুর হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৪২. প্রথম বাক্য এবং এ বাক্যটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফাঁক রয়ে গেছে। বক্তব্যটি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে এটি আপনা আপনিই অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ পুরো বক্তব্যটি এমন ঃ হে দূত এ উপহার এর প্রেরকের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তাকে হয় আমার প্রথম কথাটি মেনে নিতে হবে অর্থাৎ মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হয়ে যেতে হবে আর নয়তো আমি সেনাদল নিয়ে তার ওপর আক্রমণ করবো।

৪৩. মাঝখানের ঘটনা উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সাবার রাণীর দূত তার উপঢৌকন ফেরত নিয়ে দেশে পৌছে গেলো এবং যা কিছু সে শুনেছিল ও দেখেছিল সব আনুপূর্বিক বর্ণনা করলো। রাণী তার কাছ থেকে হযরত সুলাইমান সম্পর্কে যা শুনলেন তা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি নিজেই বায়তুল মাকদিসে যাবেন। কাজেই তিনি রাজকীয় জৌলুশ ও সাজ–সরঞ্জাম সহকারে ফিলিস্তীনের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং হযরত সুলাইমানের দরবারে খবর পাঠালেন এই বলে ঃ আপনার দাওয়াত আপনার মুখে শুনার এবং সরাসরি আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমি নিজেই আসছি। এসব বিস্তারিত ঘটনা বাদ দিয়ে এখন শুধুমাত্র রাণী যখন বাইতুল মাকদিসের কাছে পৌছে গিয়েছিলেন এবং তার মাত্র এক–দু'দিনের পথ বাকি ছিল তখনকার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

৪৪. অর্থাৎ সেই সিংহাসনটি যে সম্পর্কে হুদ্‌হুদ পাখি বলেছিল যে, "তার সিংহাসনটি বড়ই জমকালো।" কোন কোন মুফাস্‌সির রাণীর আগমনের পূর্বে তাঁর সিংহাসন উঠিয়ে নিয়ে আসার কারণ হিসেবে এরূপ অদ্ভূত উক্তি করেছেন যে, হযরত সুলাইমান এটি দখল

করে নিতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি আশংকা করেছিলেন, রাণী যদি ইসলাম গ্রহণ করে বসেন, তাহলে তাঁর সম্পদ তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি ছাড়া দখল করা হারাম হয়ে যাবে। তাই তিনি তাঁর আসার আগেই সাত তাড়াতাড়ি তাঁর সিংহাসনটি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। কারণ এ সময় পর্যন্ত রাণীর সম্পদ–সম্পত্তি মুবাহ ছিল। আস্‌তাগ্‌ ফিরুল্লাহ একজন নবীর নিয়ত সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়। একথা মনে করা হয় না কেন যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে রাণী ও তার সভাসদদেরকে একটি মু'জিযাও দেখাতে চাচ্ছিলেন? এভাবে তারা জানতে পারতো, আল্লাহ রবুল আলামীন তাঁর নবীদেরকে কেমন সব অস্বাভাবিক শক্তি দান করেন এবং এভাবে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারতো যে, হযরত সুলাইমান (আ) যথার্থই আল্লাহর নবী। কোন কোন আধুনিক তাফসীরকার এর চেয়েও মারাত্মক অশালীন ও অনাকাংখিত কথা বলেছেন। তারা আয়াতের তরজমা এভাবে করেছেন ঃ "তোমাদের মধ্য থেকে কে আমাকে রাণীর জন্য একটি সিংহাসন এনে দেবে"? অথচ কুরআন يا تينى بعرش لها নয় বরং بعرشها বলছে। এর অর্থ হচ্ছে, "তার সিংহাসন, তার জন্য একটি সিংহাসন নয়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেহেতু রাণীরই সিংহাসন ইয়ামন থেকে উঠিয়ে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন এবং তাও আবার রাণীর এসে পড়ার আগেভাগেই, শুধুমাত্র এ কারণে এ ধরনের মনগড়া কথা তৈরি করা হয়েছে আর যে কোনভাবে কুরআনের বর্ণনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

৪৫. এ থেকে হযরত সুলাইমানের কাছে যেসব জিন ছিল তারা বর্তমান যুগের কোন কোন যুক্তিবাদী তাফসীরকারের মতানুযায়ী মানব বংশজাত ছিল অথবা সাধারণ প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী জিন নামে পরিচিত অদৃশ্য সৃষ্টি ছিল, একথা জানা যেতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন, হযরত সুলাইমানের দরবারের অধিবেশন বড় জোর তিন চার ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে হয়। বাইতুল মাক্‌দিস থেকে সাবার রাজধানী মায়ারিবের দূরত্বও পাখির উড়ে চলার পথের হিসেবে কমপক্ষে দেড় হাজার মাইল ছিল। এতদূর দেশ থেকে এক সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন এত কম সময়ে উঠিয়ে নিয়ে আসা কোন মানুষের কাজ হতে পারতো না। সে আমালিকা বংশোদ্ভুত যতই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ব্যক্তিই হোক না কেন তার পক্ষে এটা সম্ভব পর ছিলা না। আধুনিক জেট বিমানগুলোও তো এ কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম। বিষয়টা এমন নয় যে, সিংহাসন কোন বনে–জংগলে রাখা আছে এবং শুধুমাত্র সেখান থেকে উঠিয়ে আনতে হবে। বরং ব্যাপার হচ্ছে, সিংহাসন রয়েছে এক রাণীর মহলের অভ্যন্তরে। নিশ্চয়ই তার চারদিকে রয়েছে কড়া পাহারা। আবার রাণীর অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই তা আরো সংরক্ষিত জায়গায় রাখা হয়েছে। মানুষ যদি তা উঠিয়ে আনতে যায় তাহলে তার সাথে একটি ছোট খাট তড়িৎগতি সম্পন্ন সেনাদলও থাকতে হবে। হাতাহাতি লড়াই করে পাহারাদারদের পরাজিত করে তাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে আনতে হবে। দরবার শেষ হবার আগে এসব কাজ কেমন করে করা যেতে পারতো। বিষয়টির এ দিকটি ভেবে দেখলে এ কাজটি একমাত্র একজন প্রকৃত জিনের পক্ষেই করা সম্ভবপর ছিল বলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে।

৪৬. অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারেন, আমি নিজে তা উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবো না অথবা তার কোন মূল্যবান জিনিস চুরি করে নেব না।

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ ۫ۖ لِیَبْلُوَنِیْۤ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّیْ غَنِیٌّ كَرِیْمٌ ﴿۴۰﴾

কিতাবের জ্ঞান সম্পন্ন অপর ব্যক্তি বললো, "আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই আপনাকে তা এনে দিচ্ছি।"[৪৭] যখনই সুলাইমান সেই সিংহাসন নিজের কাছে রক্ষিত দেখতে পেলো, অমনি সে চিৎকার করে উঠলো, "এ আমার রবের অনুগ্রহ, আমি শোকরগুযারী করি না নাশোকরী করি, তা তিনি পরীক্ষা করতে চান।"[৪৮] আর যে ব্যক্তি শোকরগুযারী করে তার শোকর তার নিজের জন্যই উপকারী। অন্যথায় কেউ অকৃতজ্ঞ হলে, আমার রব কারো ধার ধারেন না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি মহীয়ান।[৪৯]

৪৭. এ ব্যক্তি কে ছিল, তার কাছে কোন্ বিশেষ ধরনের জ্ঞান ছিল এবং যে কিতাবের জ্ঞান তার আয়ত্বাধীন ছিল সেটি কোন্ কিতাব ছিল, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা বলা সম্ভবপর নয়। কুরআনে বা কোন সহীহ হাদীসে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা হয়নি। তাফসীরকারদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, সে ছিল একজন ফেরেশতা আবার কেউ কেউ বলেন, একজন মানুষই ছিল। তারপর সে মানুষটিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে। কেউ আসফ ইবনে বরখিয়াহ (Asaf- B-Barchiah) -এর নাম বলেন। ইহুদী রাব্বীদের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন মানব প্রধান (Prince of Men) কেউ বলেন, তিনি ছিলেন খিযির। কেউ অন্য কারোর নাম নেন। আর ইমাম রাযী এ ব্যাপারে জোর দিয়ে বলতে চান যে, তিনি ছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজেই। কিন্তু এদের কারো কোন নির্ভরযোগ্য উৎস নেই। আর ইমাম রাযীর বক্তব্য তো কুরআনের পূর্বাপর আলোচনার সাথে কোন সামঞ্জস্য রাখে না। এভাবে কিতাব সম্পর্কেও মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। কেউ বলেন, এর অর্থ লাওহে মাহফুজ এবং কেউ বলেন, শরীয়াতের কিতাব। কিন্তু এগুলো সবই নিছক অনুমান। আর কিতাব থেকে ঐ ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কেও বিনা যুক্তি–প্রমাণে ঐ একই ধরনের অনুমানের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র কুরআনে যতটুকু কথা বলা হয়েছে অথবা তার শব্দাবলী থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে ততটুকু কথাই জানি ও মানি। ঐ ব্যক্তি কোনক্রমেই জিন প্রজাতির অন্তরভুক্ত ছিলেন না এবং তার মানব প্রজাতির অন্তরভুক্ত হওয়াটা মোটেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। তিনি কোন অস্বাভাবিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার এ জ্ঞান আল্লাহর কোন কিতাব থেকে সংগৃহীত ছিল। জিন নিজের দৈহিক শক্তি বলে

কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ সিংহাসন উঠিয়ে আনার দাবী করছিল। কিন্তু এ ব্যক্তি আসমানী কিতাবের শক্তিবলে মাত্র এক লহমার মধ্যে তা উঠিয়ে আনলেন।

৪৮. কুরআন মজীদের বর্ণনাভংগী এ ব্যাপারে একদম পরিষ্কার। এ বর্ণনা অনুসারে, সেই দানবাকৃতির জিনের মতো এ ব্যক্তির দাবী নিছক দাবীই ছিল না। বরং প্রকৃতপক্ষে তিনি দাবী করার পরপরই মাত্র এক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেলো সিংহাসনটি হযরত সুলাইমানের (আ) সামনে রাখা আছে। এ শব্দগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

"সেই ব্যক্তি বললো, আমি চোখের পলক ফেলতেই তা নিয়ে আসছি। তখনই সুলাইমান তা তাঁর নিজের কাছে রক্ষিত দেখতে পেলো।"

ঘটনাটি কেমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সে কথা মন থেকে বের করে দিয়ে যে ব্যক্তি এ বাক্যাংশটি পড়বে, সে এ থেকে এ অর্থই গ্রহণ করবে যে, ঐ ব্যক্তির একথা বলার সাথে সাথেই সে যা দাবী করেছিল তা ঘটে গেলো। এ সোজা সরল কথাটিকে অনর্থক টানা হেঁচড়া করে এর ভিন্ন অর্থ করার কি দরকার ছিল? তারপর সিংহাসন দেখতেই হযরত সুলাইমানের একথা বলা : "এ আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি অথবা অনুগ্রহ অস্বীকারকারী হয়ে যাই" — এমন এক অবস্থায় এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা হলে তবেই যথাযথ হতে পারে। অন্যথায় যদি ঘটনা এমনটিই হতো, তাঁর একজন চালাক-চতুর ও করিতকর্মা কর্মচারী রাণীর জন্য অতিদ্রুত একটি সিংহাসন তৈরি করে বা তৈরি করিয়ে নিয়ে আসতো, তাহলে বলা নিষ্প্রয়োজন যে তা এমন কোন অভিনব ব্যাপার হতো না যে, এ জন্য হযরত সুলাইমান বে এখতিয়ার هٰـذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ (এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ) বলে চিৎকার করে উঠতেন এবং তাঁর মনে আশংকা জাগতো যে, এত দ্রুত সম্মানীয় অতিথির জন্য সিংহাসন তৈরি হবার কারণে আমি আবার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে তাঁর নিয়ামত অস্বীকারকারী হয়ে যাই। সামান্য এতটুকু ঘটনায় একজন মু'মিন শাসনকর্তার এত বেশী অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে যাবার কী এমন আশংকা হতে পারে, বিশেষ করে যখন তিনি একজন সাধারণ ও মামুলি পর্যায়ের মু'মিন নন বরং আল্লাহর নবী?

এরপর যে প্রশ্নটির নিষ্পত্তি বাকী থাকে তা এই যে, চোখের পলক ফেলতেই দেড় হাজার মাইল দূর থেকে একটি সিংহাসন কেমন করে উঠে এলো? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, স্থান-কাল এবং বস্তু ও গতি সম্পর্কে যে ধারণা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরী করে রেখেছি সেসবের যাবতীয় সীমারেখা কেবল মাত্র আমাদের নিজেদের জন্যই সংগত। আল্লাহর জন্য এসব ধারণা সঠিক নয় এবং তিনি এসব সীমানার মধ্যে আবদ্ধও নন। তিনি নিজের অসীম ক্ষমতাবলে একটি নিতান্ত মামুলি সিংহাসন তো দূরের কথা সূর্য এবং তার চাইতেও বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্রকেও মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করাতে পারেন। যে আল্লাহর একটি মাত্র হুকুমে এ বিশাল বিশ্ব-জগতের জন্ম হয়েছে। তাঁর সামান্য একটি ইশারায়ই সাবার রাণীর সিংহাসনকে আলোকের গতিতে চালিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাঁর

এক বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক রাতে মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়েও এনেছিলেন, একথা তো কুরআনেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৯. অর্থাৎ তিনি কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না আবার কারো অকৃতজ্ঞতার ফলে তাতে এক চুল পরিমাণ কমতিও হয় না। তিনি নিজস্ব শক্তি বলে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। বান্দাদের মানা না মানার ওপর তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। কুরআন মজীদে একথাটিই এক জায়গায় হযরত মূসার মুখ দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ –

"যদি তোমরা এবং সারা দুনিয়াবাসীরা মিলে কুফরী করো তাহলেও তাতে আল্লাহর কিছু এসে যায় না এবং আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।" (ইবরাহীম, ৮)

সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতেও এ একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَازَادَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا – يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا – يَا عِبَادِى اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالَكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا – فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَالِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ –

"মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে তার ফলে আমার বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বে কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটে না। হে আমার বান্দারা! যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী বদকার ব্যক্তিটির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে এর ফলে আমার বাদশাহীতে কোন কমতি দেখা যাবে না। হে আমার বান্দারা! এগুলো তোমাদের নিজেদেরই কর্ম, তোমাদের হিসেবের খাতায় আমি এগুলো গণনা করি, তারপর এগুলোর পুরোপুরি প্রতিদান আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। কাজেই যার ভাগ্যে কিছু কল্যাণ এসেছে তার আল্লাহর শোকরগুজারী করা উচিত এবং যে অন্যকিছু লাভ করেছে তার নিজেকে ভর্ৎসনা করা উচিত।"

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

সুলাইমান[৫০] বললো, "সে চিনতে না পারে এমনভাবে সিংহাসনটি তার সামনে রেখে দাও, দেখি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় কিনা অথবা যারা সঠিক পথ পায় না তাদের অন্তরভুক্ত হয়।"[৫১] রাণী যখন হাজির হলো, তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলতে লাগলো, "এ তো যেন সেটিই।[৫২] আমরা তো আগেই জেনেছিলাম এবং আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছিলাম। (অথবা আমরা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলাম।)"[৫৩] আল্লাহর পরিবর্তে যেসব উপাস্যের সে পূজা করতো তাদের পূজাই তাকে ঈমান আনা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কারণ সে ছিল একটি কাফের জাতির অন্তরভুক্ত।[৫৪]

৫০. রাণী কিভাবে বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে গেলেন এবং কিভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো সে ঘটনা মাঝখানে উহ্য রাখা হয়েছে। এ ঘটনার কথা আলোচনা না করে এবার এখানে যখন তিনি হযরত সুলাইমানের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তাঁর মহলে পৌঁছে গেলেন তখনকার কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

৫১. তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য। এর অর্থ হচ্ছে, হঠাৎ তিনি স্বদেশ থেকে এত দূরে নিজের সিংহাসন দেখে একথা বুঝতে পারেন কি না যে এটা তাঁরই সিংহাসন এবং এটা উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আবার এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে তিনি সত্য–সঠিক পথের সন্ধান পান অথবা নিজের ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করতে থাকেন কি না— এ অর্থও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

যারা বলেন, হযরত সুলাইমান (আ) এ সিংহাসন হস্তগত করতে চাচ্ছিলেন, এ থেকে তাদের ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়। এখানে তিনি নিজেই প্রকাশ করছেন, রাণীকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্যই তিনি এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

৫২. এথেকে তাদের চিন্তার ভ্রান্তিও প্রমাণিত হয়, যারা ঘটনাটিকে কিছুটা এভাবে চিত্রিত করেছেন যেন হযরত সুলাইমান তাঁর সম্মানীয় মেহমানের জন্য একটি সিংহাসন তৈরি করতে চাচ্ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি টেণ্ডার তলব করলেন। একজন বলিষ্ঠ সুঠামদেহী কারিগর কিছু বেশী সময় নিয়ে সিংহাসন তৈরি করে দেবার প্রস্তাব দিল। কিন্তু অন্য একজন পারদর্শী ওস্তাদ কারিগর বললো, আমি অতি দ্রুত অতি অল্প সময়ের মধ্যে

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

তাকে বলা হলো, প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করো। যেই সে দেখলো মনে করলো বুঝি কোন জলাধার এবং নামার জন্য নিজের পায়ের নিম্নাংশের বস্ত্র উঠিয়ে নিল। সুলাইমান বললো, এতো কাঁচের মসৃণ মেঝে।[৫৫] একথায় সে বলে উঠলো, "হে আমার রব! (আজ পর্যন্ত) আমি নিজের ওপর বড়ই জুলুম করে এসেছি এবং এখন আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য গ্রহণ করছি।"[৫৬]

দেখতে না দেখতেই তৈরি করে দিচ্ছি। একটি মাত্র কথাই এসব জল্পনা–কল্পনার অবসান ঘটাতে সক্ষম সেটি এই যে, হযরত সুলাইমানের (আ) নিজেই রানীর সিংহাসনটিই আনার কথা বলেছিলেন (أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসনটি আমার কাছে এনে দিতে পারে?) সিংহাসনটি নিয়ে আসার পর তিনি তারই সিংহাসন অপরিচিত পদ্ধতিতে তারই সামনে উপস্থাপিত করার জন্য কর্মচারীদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا । তারপর যখন তিনি এলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সিংহাসন কি এ রকম (أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ) ? তিনি জাবেবে বললেন, এটা যেন সেটাই (كَأَنَّهُ هُوَ) । এ ধরনের সুস্পষ্ট বর্ণনার উপস্থিতিতে ঐসব জল্পনা কল্পনার অবকাশ কোথায়? এরপরও যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে পরবর্তী বাক্য তাঁকে নিশ্চিন্ত করার জন্য যথেষ্ট।

৫৩. অর্থাৎ এ মু'জিযা দেখার আগেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের যেসব গুণাবলী ও বিবরণ আমরা জেনেছিলাম তার ভিত্তিতে আমাদের বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, তিনি নিছক একটি রাজ্যের শাসনকর্তা নন বরং আল্লাহর একজন নবী। যদি এটা মনে করে নেয়া হয় যে, হযরত সুলাইমান (আ) তার জন্য একটি সিংহাসন তৈরী করে রেখে দিয়েছিলেন, তাহলে সিংহাসন দেখার এবং "যেন এটা সেটাই" বলার পর এ বাক্যটি জুড়ে দেয়ার কি স্বার্থকতা থাকে? ধরে নেয়া যাক, যদি রাণীর সিংহাসনের অনুরূপ ঐ সিংহাসনটি তৈরী করা হয়ে থাকে তাহলেও তার মধ্যে এমন কি মাহাত্ম ছিল যার ফলে একজন সূর্য পূজারিনী রাণী তা দেখে বলে উঠলেন أُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ "আমাদের আগেই এ জ্ঞানলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল এবং আমরা মুসলিম হয়ে গিয়ে ছিলাম।"

৫৪. এ বাক্যাংশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অবস্থান সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে জিদ ও একগুয়েমী ছিল না। শুধুমাত্র কাফের জাতির মধ্যে জন্ম নেয়ার কারণেই তিনি তখনো পর্যন্ত কাফের ছিলেন। সচেতন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হবার পর থেকেই যে জিনিসের সামনে সিজদানত হবার অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সেটিই

ছিল তার পথের প্রতিবন্ধক। হযরত সুলাইমানের (আ) মুখোমুখি হবার পর যখন তার চোখ খুলে তখন এ প্রতিবন্ধক দূর হতে এক মুহূর্তও দেরী হয়নি।

৫৫. এটি ছিল রাণীর সামনে প্রকৃত সত্য উদঘাটনকারী সর্বশেষ উপকরণ। প্রথম উপকরণটি ছিল হযরত সুলাইমানের পত্র। সাধারণ বাদশাহী রীতি এড়িয়ে আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে তা শুরু করা হয়েছিল। দ্বিতীয় উপকরণটি ছিল মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রত্যাখ্যান। এ থেকে রাণী বুঝতে পারলেন যে, ইনি এক অসাধারণ রাজা। তৃতীয় উপকরণটি ছিল রাণীর দূতের বর্ণনা। এ থেকে তিনি হযরত সুলাইমানের তাকওয়া ভিত্তিক জীবন, তাঁর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং তাঁর সত্যের দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত হন। এ জিনিসটিই তাঁকে অগ্রণী হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের একটি উক্তির মাধ্যমে তিনি এদিকেই ইংগিত করেন। এ উক্তিতে তিনি বলেন ঃ আমরা তো আগেই জেনেছিলাম এবং আমরা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলাম। চতুর্থ উপকরণটি ছিল এ মহান মূল্যবান সিংহাসনটির মুহূর্তকালের মধ্যে মায়ারিব থেকে বাইতুল মাকদিসে পৌছে যাওয়া। এর ফলে রাণী জানতে পারেন এ ব্যক্তির পেছনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি রয়েছে। আর এখন সর্বশেষ উপকরণটি ছিল এই যে, রাণী দেখলেন যে ব্যক্তি এহেন আরাম আয়েশ ও পার্থিব ভোগের সামগ্রীর অধিকারী এবং এমন নয়নাভিরাম ও জাঁকালো প্রাসাদে বাস করেন তিনি আত্মগরিমা ও আত্মম্ভরিতা থেকে কত দূরে অবস্থান করেন, তিনি কেমন আল্লাহকে ভয় করেন, কেমন সৎ হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, কেমন কথায় কথায় কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দেন এবং পৃথিবী পূজারী লোকদের জীবন থেকে তার জীবন কত ভিন্নতর। এ জিনিসই এমন সব কথা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারণ করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল, যা সামনের দিকে তাঁর মুখ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৫৬. হযরত সুলাইমান (আ) ও সাবার রাণীর এ কাহিনী বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মে এবং ইহুদী বর্ণনাবলীতে সব জায়গায় বিভিন্ন ভংগীতে এসেছে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা এদের সবার থেকে আলাদা। পুরাতন নিয়মে এ কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

> "আর শিবার রাণী সদাপ্রভুর নামের পক্ষে শলোমনের কীর্তি শুনিয়া গূঢ়বাক্য দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করিতে আসিলেন। তিনি অতি বিপুল ঐশ্বর্যসহ, সুগন্ধি দ্রব্য, অতি বিস্তর স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সংগে লইয়া যিরুশালেমে আসিলেন, এবং শলোমনের নিকটে আসিয়া নিজের মনে যাহা ছিল, তাঁহাকে সমস্তই কহিলেন। আর শলোমন তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিলেন;......................এই প্রকারে শিবার রাণী শলোমনের সমস্ত জ্ঞান ও তাঁহার নির্মিত গৃহ, এবং তাঁহার মেজের খাদ্য দ্রব্য ও তাঁহার সেবকদের উপবেশন ও দণ্ডায়মান পরিচারকদের শ্রেণী ও তাহাদের পরিচ্ছদ এবং তাঁহার পানপাত্র বাহকগণ ও সদাপ্রভুর গৃহে উঠিবার জন্য তাঁহার নির্মিত সোপান, এই সকল দেখিয়া হত জ্ঞান হইলেন। আর তিনি রাজাকে কহিলেন, আমি আপন দেশে থাকিয়া আপনার বাক্য ও জ্ঞানের বিষয় যেকথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই; আর দেখুন, অর্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আপনার জ্ঞান ও মঙ্গল অধিক। ধন্য আপনার লোকেরা, ধন্য আপনার

এই দাসেরা, যাহারা নিয়ত আপনার সম্মুখে দাঁড়ায়, যাহারা আপনার জ্ঞানের উক্তি শুনে। ধন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি আপনাকে ইসরাঈলের সিংহাসনে বসাইবার জন্য আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন...........পরে তিনি বাদশাহকে একশত বিশ তালন্ত স্বর্ণ ও অতি প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিলেন, শিবার রাণী শলোমন রাজাকে যত সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন, তত প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য আর কখনো আসে নাই।........আর শলোমন রাজা শিবার রাণীর বাসনা অনুসারে তাঁহার যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য দিলেন, তাহা ছাড়া শলোমন আপন রাজকীয় দানশীলতা অনুসারে তাঁহাকে আরও দিলেন। পরে তিনি ও তাঁহার দাসগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।" (১–রাজাবলী ১০ঃ১–১৩ প্রায় একই বিষয়বস্তু সম্বলিত কথা ২–বংশাবলী ৯ঃ১–১২ তেও এসেছে।)

নতুন নিয়মে হযরত ঈসার ভাষণের শুধুমাত্র একটি বাক্য সাবার রাণী সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন, আর দেখ শলোমন হইতে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।" (মথি ১২ঃ৪২ এবং লূক ১১ঃ৩১)

ইহুদী রব্বীরা হযরত সুলাইমান ও সাবার রাণীর যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তার বেশীর ভাগ বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের সাথে মিলে যায়। হুদহুদ পাখির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, তারপর ফিরে এসে তার সাবার রাণীর অবস্থা বর্ণনা করা, তার মাধ্যমে হযরত সুলাইমানের পত্র পাঠানো, হুদহুদের পত্রটি ঠিক তখনই রাণীর সামনে ফেলে দেয়া যখন তিনি সূর্য পূজা করতে যাচ্ছিলেন, পত্রটি দেখে রাণীর মন্ত্রীপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠান করা, তারপর রাণীর একটি মূল্যবান উপঢৌকন সুলাইমানের কাছে পাঠানো, নিজে জেরুসালেমে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করা, তাঁর সুলাইমানের মহলে এসে বাদশাহ জলাধারের মধ্যে বসে আছেন বলে মনে করা এবং তাতে নেমে পড়ার জন্য নিজের পরণের কাপড় হাঁটুর কাছে উঠিয়ে নেয়া— এসব সে বর্ণনাগুলোতে কুরআনে যেমনি আছে ঠিক তেমনিভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এ উপঢৌকন লাভ করার পর হযরত সুলাইমানের জবাব, রাণীর সিংহাসন উঠিয়ে আনা, প্রত্যেকটি ঘটনায় তাঁর আল্লাহর সামনে মাথা নত করা এবং সবশেষে তাঁর হাতে রাণীর ঈমান আনা—এসব কথা এমনকি আল্লাহর আনুগত্য ও তাওহীদের সমস্ত কথাই এ বর্ণনাগুলোতে অনুপস্থিত। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, এই জালেমরা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, তিনি সাবার রাণীর সাথে নাউযুবিল্লাহ ব্যভিচার করেন। আর এর ফলে যে জারজ সন্তানটি জন্মলাভ করে সে–ই হয় পরবির্তীকালে বাইতুল মাকদিস ধ্বংসকারী ব্যবিলনের বাদশাহ বখ্‌তে নাস্‌সার। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়া, ১১ খণ্ড ৪৪৩ পৃষ্ঠা) আসল ব্যাপার হচ্ছে, ইহুদী আলেমদের একটি দল হযরত সুলাইমানের কঠোর বিরোধী ছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে তাওরাতের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, রাষ্ট্র পরিচালনায় আত্মম্ভরিতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অহংকার, নারী আসক্তি, বিলাসী জীবন যাপন এবং শির্‌ক ও মূর্তি পূজার জঘন্য অভিযোগ এনেছেন। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়া, ১১ খণ্ড, ৪৩৯–৪৪১ পৃষ্ঠা) এ প্রচারনার প্রভাবে বাইবেল তাঁকে নবীর পরিবর্তে নিছক একজন বাদশাহ হিসেবেই উল্লেখ করেছে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪ রুকূ'

আর আমি[৫৭] সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে (এ পয়গাম সহকারে) পাঠালাম যে, আল্লাহর বন্দেগী করো এমন সময় সহসা তারা দু'টি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে গেলো।[৫৮] সালেহ বললো, "হে আমার জাতির লোকেরা! ভালোর পূর্বে তোমরা মন্দকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো কেন?[৫৯] আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাচ্ছো না কেন? হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে।"

আবার বাদশাহও এমন যিনি নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ মুশরিক মেয়েদের প্রেমে মত্ত হয়ে গেছেন। যাঁর অন্তর আল্লাহ বিমুখ হয়ে গেছে এবং যিনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য মাবুদদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। (১ রাজাবলী ১১ঃ ১-১১) এসব দেখে বুঝা যায় কুরআন বনী ইসরাঈলদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছে। নিজেদের জাতীয় মনীষীদের জীবন ও চরিত্রকে তারা নিজেরাই কলূষিত করেছে এবং কুরআন সেই কলূষ কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। অথচ এ বনী ইসরাঈল কতই অকৃতজ্ঞ জাতি, এরপরও তারা কুরআন ও তার বাহককে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে।

৫৭. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য সূরা আল আ'রাফের ৭৩ থেকে ৭৯, হূদের ৬১ থেকে ৬৮, আশ্ শু'আরার ৪১ থেকে ৫৯, আল কামারের ২৩ থেকে ৩২ এবং আশ্ শামসের ১১ থেকে ১৫ আয়াত পড়ুন।

৫৮. অর্থাৎ হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত শুরু হবার সাথে সাথেই তাঁর জাতি দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। একটি দল মু'মিনদের এবং অন্যটি অস্বীকারকারীদের এ বিভক্তির সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতও শুরু হয়ে গেলো। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ -

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

তারা বললো, "আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথিদেরকে অমংগলের নিদর্শন হিসেবে পেয়েছি।"৬০ সালেহ জবাব দিল, তোমাদের মংগল অমংগলের উৎস তো আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ, আসলে তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।"৬১

"তার জাতির শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে গর্বিত সরদাররা দলিত ও নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বললো, সত্যই কি তোমরা জানো, সালেহ তার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন নবী? তারা জবাব দিল, তাকে যে জিনিস সহকারে পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান রাখি। এ অহংকারীরা বললো, তোমরা যে জিনিসের প্রতি ঈমান এনেছো আমরা তা মানি না।" (আ'রাফ ৭৫–৭৬ আয়াত)

মনে রাখতে হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সাথে সাথে মক্কায়ও এ একই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই যে অবস্থার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তার সাথে এ কাহিনী আপনা থেকেই খাপ খেয়ে যাচ্ছিল।

৫৯. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণ চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছো কেন? অন্য জায়গায় সালেহের জাতির সরদারদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

يَـٰصَـٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ –

"হে সালেহ! আনো সেই আযাব আমাদের ওপর, যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে থাকো, যদি সত্যি তুমি রসূল হয়ে থাকো।" (আল আ'রাফ ঃ ৭৭)

৬০. তাদের উক্তির একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমার এ আন্দোলন আমাদের জন্য বড়ই অমংগলজনক প্রমাণিত হয়েছে। যখন থেকে তুমি ও তোমার সাথীরা পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছো তখন থেকেই নিত্যদিন আমাদের ওপর কোন না কোন বিপদ আসছে। কারণ আমাদের উপাস্যরা আমাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেছে। এ অর্থের দিক দিয়ে আলোচ্য উক্তিটি সেই সব মুশরিক জাতির উক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল, যারা নিজেদের নবীদেরকে অপয়া গণ্য করতো। সূরা ইয়াসীনে একটি জাতির কথা বলা হয়েছে। তারা তাদের নবীদেরকে বললো ঃ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ "আমরা তোমাদের অপয়া পেয়েছি" (১৮ আয়াত) হযরত মূসা সম্পর্কে ফেরাউনের জাতি এ কথাই বলতো ঃ

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ –

"যখন তাদের সুসময় আসতো, তারা বলতো আমাদের এটাই প্রাপ্য এবং যখন কোন বিপদ আসতো তখন মুসা ও তার সাথিদের কুলক্ষুণে হওয়াটাকে এ জন্য দায়ী মনে করতো।" (আল আ'রাফঃ ১৩০ আয়াত)

প্রায় একই ধরনের কথা মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও বলা হতো।

এ উক্তিটির দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমার আসার সাথে সাথেই আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। পূর্বে আমরা ছিলাম এক জাতি। এক ধর্মের ভিত্তিতে আমরা সবাই একত্র সংঘবদ্ধ ছিলাম। তুমি এমন অপয়া ব্যক্তি এলে যে, তোমার আসার সাথে সাথেই ভাই-ভাইয়ের দুশমন হয়ে গেছে এবং পুত্র-পিতা থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এভাবে জাতির মধ্যে আর একটি নতুন জাতির উত্থানের পরিণাম আমাদের চোখে ভালো ঠেকছে না। এ অভিযোগটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে বারবার পেশ করতো। তাঁর দাওয়াতের সূচনাতেই কুরাইশ সরদারদের যে প্রতিনিধি দলটি আবু তালেবের নিকট এসেছিল তারা এ কথাই বলেছিল ঃ "আপনার এ ভাতিজাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। সে আপনার ও আপনার বাপদাদার ধর্মের বিরোধিতা করছে, আপনার জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সমগ্র জাতিকে বেকুব গণ্য করেছে।" ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা) হজ্জের সময় মক্কার কাফেরদের যখন আশংকা হলো যে, বাইরের যিয়ারতকারীরা এসে যেন আবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে। তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করার পর আরব গোত্রগুলোকে একথা বলার সিদ্ধান্ত নেয় ঃ

"এ ব্যক্তি একজন যাদুকর। এর যাদুর প্রভাবে পুত্র-পিতা থেকে, ভাই-ভাই থেকে, স্ত্রী-স্বামী থেকে এবং মানুষ তার সমগ্র পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।" (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ২৮৯ পৃষ্ঠা)

৬১. অর্থাৎ তোমরা যা মনে করছো আসল ব্যাপার তা নয়। আসল ব্যাপারটি তোমরা এখনো বুঝতে পারোনি। সেটি হচ্ছে, আমার আসার ফলে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। যতদিন আমি আসিনি ততদিন তোমরা নিজেদের মূর্খতার পথে চলছিলে। তোমাদের সামনে হক ও বাতিলের কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য-রেখা ছিল না। ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করার কোন মানদণ্ড ছিল না। অত্যধিক নিকৃষ্ট লোকেরা উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল এবং সবচেয়ে ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন লোকেরা মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন একটি মানদণ্ড এসে গেছে। তোমাদের সবাইকে এখানে যাচাই ও পরখ করা হবে। এখন মাঠের মাঝখানে একটি তুলাদণ্ড রেখে দেয়া হয়েছে। এ তুলাদণ্ড প্রত্যেককে তার ওজন অনুযায়ী পরিমাপ করবে। এখন হক ও বাতিল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যে হককে গ্রহণ করবে সে ওজনে ভারী হয়ে যাবে, চাই এ যাবত তার মূল্য কানাকড়িও না থেকে থাকুক। আর যে বাতিলের ওপর অবিচল থাকবে তার ওজন এক রত্তিও হবে না। চাই এ যাবত সে সর্বোচ্চ নেতার পদেই অধিষ্ঠিত থেকে থাকুক না কেন। কে কোন্ পরিবারের লোক, কার সহায় সম্পদ কি পরিমাণ আছে এবং কে কতটা শক্তির অধিকারী তার ভিত্তিতে এখন আর কোন ফায়সালা হবে না। বরং কে সোজাভাবে সত্যকে গ্রহণ করে এবং কে মিথ্যার সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে দেয়- এরি ভিত্তিতে ফায়সালা হবে।

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

সে শহরে ছিল ন'জন দল নায়ক[৬২] যারা দেশের বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং কোন গঠনমূলক কাজ করতো না। তারা পরস্পর বললো, "আল্লাহর কসম খেয়ে শপথ করে নাও, আমরা সালেহ ও তার পরিবার পরিজনদের ওপর নৈশ আক্রমণ চালাবো এবং তারপর তার অভিভাবককে[৬৩] বলে দেবো আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলাম না, আমরা একদম সত্য কথা বলছি।"[৬৪] এ চক্রান্ত তো তারা করলো এবং তারপর আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না।[৬৫] অবশেষে তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হলো দেখে নাও। আমি তাদেরকে এবং তাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম। ঐ যে তাদের গৃহ তাদের জুলুমের কারণে শূন্য পড়ে আছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষনীয় নিদর্শন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্যে।[৬৬] আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে দূরে অবস্থান করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

৬২. অর্থাৎ ন'জন উপজাতীয় সরদার। তাদের প্রত্যেকের সাথে ছিল একটি বিরাট দল।

৬৩. অর্থাৎ হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের গোত্রের সরদারকে। প্রাচীন গোত্রীয় রেওয়াজ অনুযায়ী তাঁকে হত্যা করার বিরুদ্ধে তাঁর গোত্রীয় সরদারেরই রক্তের দাবী পেশ করার অধিকার ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় তার চাচা আবু তালেবেরও এ একই অধিকার ছিল। কুরাইশ বংশীয় কাফেররাও এ আশংকায় পিছিয়ে আসতো যে, যদি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে ফেলে তাহলে বনু হাশেমের সরদার আবু তালেব নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে তাঁর খুনের বদলা নেবার দাবী নিয়ে এগিয়ে আসবে।

৬৪. হুবহু এ একই ধরনের চক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে করার জন্য মক্কার গোত্রীয় সরদাররা চিন্তা করতো। অবশেষে হিজরতের সময় তারা নবীকে (সা) হত্যা করার জন্য এ চক্রান্ত করলো। অর্থাৎ তারা সব গোত্রের লোক একত্র হয়ে তাঁর ওপর হামলা করবে। এর ফলে বনু হাশেম কোন একটি বিশেষ গোত্রকে অপরাধী গণ্য করতে পারবে না এবং সকল গোত্রের সাথে একই সংগে লড়াই করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

৬৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের স্থিরীকৃত সময়ে হযরত সালেহের ওপর নৈশ আক্রমণ করার পূর্বেই আল্লাহ তাঁর আযাব নাযিল করলেন এবং এর ফলে কেবলমাত্র তারা নিজেরাই নয় বরং তাদের সমগ্র সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেলো। মনে হয়, উটনীর পায়ের রগ কেটে ফেলার পর তারা এ চক্রান্তটি করেছিল। সূরা হূদে বলা হয়েছে, যখন তারা উটনীকে মেরে ফেললো তখন হযরত সালেহ তাদেরকে নোটিশ দিলেন। তাদেরকে বললেন, ব্যস, আর মাত্র তিন দিন ফুর্তি করে নাও, তারপর তোমাদের ওপর আযাব এসে যাবে (فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ، ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ) একথায় সম্ভবত তারা চিন্তা করেছিল, সালেহের (আ) কথিত আযাব আসুক বা না আসুক আমরা উটনীর সাথে তারও বা দফা রফা করে দিই না কেন। কাজেই খুব সম্ভবত নৈশ আক্রমণ করার জন্য তারা সেই রাতটিই বেছে নেয়, যে রাতে আযাব আসার কথা ছিল এবং হযরত সালেহের গায়ে তারা হাত দেবার আগেই আল্লাহর জবরদস্ত হাত তাদেরকে পাকড়াও করে ফেললো।

৬৬. অর্থাৎ মূর্খদের ব্যাপার আলাদা। তারা তো বলবে, সামূদ জাতি যে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় তার সাথে হযরত সালেহ ও তাঁর উটনীর কোন সম্পর্ক নেই। এসব তো প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে। এ এলাকায় কে সৎকাজ করতো এবং কে অসৎকাজ করতো আর কে কার ওপর জুলুম করেছিল এবং কে করেছিল অনুগ্রহ, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসার ওপর এসব বিষয়ের কোন দখল নেই। অমুক শহর বা অমুক এলাকা ফাসেকী ও অশ্লীল কার্যকলাপে ভরে গিয়েছিল তাই সেখানে বন্যা এসেছিল বা ভূমিকম্প দ্বারা সে এলাকাটিকে ওলট পালট করে দেয়া হয়েছিল। কিংবা কোন আকস্মিক মহা প্রলয় তাকে বিধ্বস্ত করেছিল, এসব নিছক ওয়াজ নসিহতকারীদের গালভরা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান লোক মাত্রই জানেন, কোন অন্ধ ও বধির আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহানের ওপর রাজত্ব করছেন না বরং এক সর্বজ্ঞ ও পরম বিজ্ঞ সত্তা এখানে সকলের ভাগ্যের নিষ্পত্তি করছেন। তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ প্রাকৃতিক কার্যকারণের অধীন নয় বরং প্রাকৃতিক কার্যকারণসমূহ তাঁর ইচ্ছার অধীন। তিনি চোখ বন্ধ করে জাতিসমূহের উত্থান–পতনের ফায়সালা করেন না বরং বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে করেন। একটি প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনও তাঁর আইনগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ আইনের দৃষ্টিতে নৈতিক ভিত্তিতে এ দুনিয়াতেও জালেমকে শাস্তি দেয়া হয়। এ সত্যগুলো সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিরা কখনো ঐ ভূমিকম্পকে প্রাকৃতিক কারণ প্রসূত বলে এড়িয়ে যেতে চাইবে না। তারা তাকে নিজেদের জন্য সতর্কীকরণ মূলক বেত্রাঘাত মনে করবে। তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। স্রষ্টা যেসব নৈতিক কারণের ভিত্তিতে নিজের সৃষ্ট একটি সমৃদ্ধ বিকাশমান জাতিকে ধ্বংস করে দেন তারা তার নৈতিক কারণসমূহ অনুধাবন করার

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾

আর[৬৭] লূতকে আমি পাঠালাম। স্মরণ করো তখনকার কথা যখন সে তার জাতিকে বললো, "তোমরা জেনে বুঝে বদকাম করছো?[৬৮] তোমাদের কি এটাই রীতি, কাম–তৃপ্তির জন্য তোমরা মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও? আসলে তোমরা ভয়ানক মূর্খতায় লিপ্ত হয়েছো।"[৬৯] কিন্তু সে জাতির এছাড়া আর কোন জবাব ছিল না যে, তারা বললো, "লূতের পরিবারবর্গকে তাদের নিজেদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা বড় পাক–পবিত্র সাজতে চাচ্ছে।" শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে নিলাম তবে তার স্ত্রীকে নয়। কারণ তার পেছনে থেকে যাওয়াটাই আমি স্থির করে দিয়েছিলাম।[৭০] আর বর্ষণ করলাম তাদের ওপর একটি বৃষ্টি, বড়ই নিকৃষ্ট ছিল সেই বৃষ্টি যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য।

চেষ্টা করবে। তারা নিজেদের কর্মনীতিকে এমন পথ থেকে সরিয়ে আনবে যে পথে আল্লাহর গযব আসে এবং এমন পথে তাকে পরিচালিত করবে যে পথে তাঁর রহমত নাযিল হয়।

৬৭. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল আ'রাফ ৮০ থেকে ৮৪, হূদ ৭৪ থেকে ৮৩, আল হিজর ৫৭ থেকে ৭৭, আল আম্বিয়া ৭১ থেকে ৭৫, আশ্‌ শু'আরা ১৬০ থেকে ১৭৪, আল আনকাবুত ২৮–৭৫, আস্‌ সাফ্‌ফাত ১৩৩ থেকে ১৩৮ এবং আল কামার ৩৩ থেকে ৩৯ আয়াত।

৬৮. এ উক্তির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। সম্ভবত এ সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, এ কাজটি যে অশ্লীল ও খারাপ তা তোমরা জানো না এমন নয়। বরং জেনে বুঝে তোমরা এ কাজ করো। দুই, একথাটিও তোমাদের অজানা নেই যে, পুরুষের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়নি বরং এজন্য নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পুরুষ ও নারীর পার্থক্য এমন নয় যে, তা তোমাদের চোখে ধরা পড়ে না বরং তোমরা চোখে দেখেই এ জ্বলজ্যান্ত মাছি গিলে ফেলছো। তিন, তোমরা প্রকাশ্যে এ অশ্লীল কাজ করে

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ⑤٩

৫ রুকূ'

(হে নবী!)[৭১] বলো, প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তাঁর এমনসব বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেছেন।

(তাদেরকে জিজ্ঞেস করো) আল্লাহ ভালো অথবা সেই সব মাবুদরা ভালো যাদেরকে তারা তাঁর শরীক করছে?[৭২]

যাচ্ছো। অন্যদিকে চক্ষুষ্মান লোকেরা তোমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছে, যেমন সামনের দিকে সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ

وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ -

"আর তোমরা নিজেদের মজলিসে বদকাম করে থাকো" (২৯ আয়াত)

৬৯. মূলে জিহালত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এখানে নিবুর্দ্ধিতা ও বোকামি। গালি গালাজ ও বেহুদা কাজ কারবার করলেও তাকে জাহেলী কাজ বলা হয়। আরবী ভাষাতে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (الفرقان : ٦٣)

কিন্তু যদি এ শব্দটিকে জ্ঞানহীনতা অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, তোমরা নিজেদের এ খারাপ কাজটির পরিণাম জানো না। তোমরা তো একথা জানো, তোমরা যা অর্জন করছো তা প্রবৃত্তিকে তৃপ্তি দান করে। কিন্তু তোমরা জানো না এ চরম অপরাধমূলক ও জঘন্য ভোগ লিপ্সার জন্য শীঘ্রই তোমাদের কেমন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর অতর্কিতে নেমে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। অথচ তোমরা পরিণামের কথা না ভেবে নিজেদের এ জঘন্য খেলায় মত্ত হয়ে আছো।

৭০. অর্থাৎ পূর্বেই হযরত লূতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তিনি যেন এ মহিলাকে নিজের সহযোগী না করেন। কারণ তার নিজের জাতির সাথেই তাকে ধ্বংস হতে হবে।

৭১. এখান থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। এ বাক্যটি হচ্ছে তার ভূমিকা। এ ভূমিকার মাধ্যমে মুসলমানরা কিভাবে তাদের বক্তৃতা শুরু করবে তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরি ভিত্তিতেই সঠিক ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা সব সময় আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া করে তাদের বক্তৃতা শুরু করে থাকেন। কিন্তু আজকাল একে মোল্লাকী মনে করা হয়ে থাকে। এবং এ যুগের মুসলিম বক্তারা তো এর মাধ্যমে বক্তৃতা শুরু করার কথা কল্পনাই করতে পারেন না অথবা এভাবে বক্তৃতা শুরু করতে তারা লজ্জা অনুভব করেন।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝٦٠

কে তিনি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন তারপর তার সাহায্যে সুদৃশ্য বাগান উৎপাদন করেছেন, যার গাছপালা উৎপন্ন করাও তোমাদের আয়ত্বাধীন ছিল না? আল্লাহর সাথে কি (এসব কাজে অংশীদার) অন্য ইলাহও আছে?[৭৩] (না,) বরং এরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এগিয়ে চলছে।

৭২. আল্লাহ ভালো না এসব মিথ্যা মাবুদ ভালো, এ প্রশ্নটি আপাত দৃষ্টিতে বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা উপাস্যদের মধ্যে তো আদৌ কোন ভালাই নেই যে, আল্লাহর সাথে তাদের তুলনা করা যেতে পারে। মুশরিকরাও আল্লাহর সাথে এ উপাস্যদের তুলনা করা যেতে পারে এমন কথা ভাবতো না। কিন্তু তারা যাতে নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয় সেজন্য এ প্রশ্ন তাদের সামনে রাখা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজ করে না যতক্ষণ না সে তার নিজের দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন কল্যাণ বা লাভের সন্ধান পায় এখন এ মুশরিকরা আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে ঐ উপাস্যদের ইবাদাত করতো, আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দোয়া করতো এবং তাদের সামনে নজরানা পেশ করতো। অথচ ঐ উপাস্যদের মধ্যে যখন কোন কল্যাণ নেই তখন তাদের এসব করার কোন অর্থই ছিল না। তাই তাদের সামনে পরিষ্কার ভাষায় এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, বলো, আল্লাহ ভালো না তোমাদের ঐসব উপাস্যরা? কারণ এ দ্ব্যর্থহীন প্রশ্নের সম্মুখীন হবার হিম্মত তাদের ছিল না। তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে কট্টর মুশরিকও একথা বলার সাহস করতে পারতো না যে, আমাদের উপাস্যরা ভালো। আর আল্লাহ ভালো একথা মেনে নেবার পর তাদের ধর্মের পুরো ভিত্তিটাই ধ্বসে পড়তো, কারণ এরপর ভালোকে বাদ দিয়ে মন্দকে গ্রহণ করা পুরোপুরি অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়াতো।

এভাবে কুরআন তার ভাষণের প্রথম বাক্যেই বিরোধীদেরকে লা জবাব ও অসহায় করে দিয়েছে। এরপর এখন আল্লাহর শক্তিমত্তা এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি বৈচিত্রের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, এটা কার কাজ বলো? আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহও কি এ কাজে শরীক আছে? যদি না থেকে থাকে তাহলে তোমরা এই যাদেরকে উপাস্য করে রেখেছো এদের কি স্বার্থকতা আছে?

হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন তখন সংগে সংগেই এর জবাবে বলতেন ঃ

بَلِ اللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى وَاَجَلُّ وَاَكْرَمُ –

"বরং আল্লাহই ভালো এবং তিনিই চিরস্থায়ী, মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ।"

৭৩. মুশরিকদের একজনও একথার জবাবে বলতে পারতো না, একাজ আল্লাহর নয়, অন্য কারো অথবা আল্লাহর সাথে অন্য কেউ তাঁর একাজে শরীক আছে। কুরআন মজীদে অন্যান্য স্থানে মক্কার কাফের সমাজ ও আরব মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ –

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, মহা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী সত্তাই এসব সৃষ্টি করেছেন।" (আয্ যুখরুফ ঃ ৯)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ –

"আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। (আয্ যুখরুফ–৮৭)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ –

"আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছে এবং মৃত পতিত জমি কে জীবিত করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" (আনকাবুতঃ ৬৩ আয়াত)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ .... وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ –

"তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন? এ শ্রবণ ও দর্শনের শক্তি কার নিয়ন্ত্রণাধীন? কে সজীবকে নির্জীব এবং নির্জীবকে সজীব করেন? কে এ বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ। (ইউনুস ঃ ৩১ আয়াত)

আরবের মুশরিকরা এবং সারা দুনিয়ার মুশরিকরা সাধারণত একথা স্বীকার করতো এবং আজো স্বীকার করে যে, আল্লাহই বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা এবং বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনাকারী। তাই কুরআন মজীদের এ প্রশ্নের জবাবে তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি নিতান্ত হঠকারিতা ও গোয়ার্তমীর আশ্রয় নিয়েও নিছক বিতর্কের খাতিরেও বলতে পারতো না যে, আমাদের উপাস্য দেবতারা আল্লাহর সাথে এসব কাজে শরীক আছে। কারণ যদি তারা

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

আর তিনি কে, যিনি পৃথিবীকে করেছেন অবস্থানলাভের উপযোগী[৭৪] এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ–নদী এবং তার মধ্যে গেড়ে দিয়েছেন (পর্বতমালার) পেরেক, আর পানির দু'টি ভাণ্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৭৫] আল্লাহর সাথে (এসব কাজে শরীক) অন্য কোন ইলাহ আছে কি? না, বরং এদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

একথা বলতো তাহলে তাদের নিজেদের জাতির হাজার হাজার লোক তাদেরকে মিথ্যুক বলতো এবং তারা পরিষ্কার বলে দিতো, এটা আমাদের আকীদা নয়।

এ প্রশ্ন এবং এর পরবর্তী প্রশ্নগুলোতে শুধুমাত্র শির্‌কই বাতিল করা হয়নি বরং নাস্তিক্যবাদকেও বাতিল করে দেয়া হয়েছে। যেমন এ প্রথম প্রশ্নেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঃ এই বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং এর সাহায্যে সবরকম উদ্ভিদ উৎপাদনকারী কে? এখন চিন্তা করুন, অজস্র রকমের উদ্ভিদের জীবনের জন্য যে ধরনের উপাদান প্রয়োজন, ভূমিতে তার ঠিক উপরিভাগে অথবা উপরিভাগের কাছাকাছি এসব জিনিসের মজুত থাকা এবং পানির মধ্যে ঠিক এমন ধরনের গুণাবলী থাকা যা প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং এ পানিকে অনবরত সমুদ্র থেকে উঠানো এবং জমির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় যথানিয়মে বর্ষণ করা আর মাটি, বাতাস, পানি ও তাপমাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে এমন পর্যায়ের আনুপাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা যার ফলে উদ্ভিদ জীবন বিকাশ লাভ করতে পারে এবং সব রকমের জৈব জীবনের জন্য তার অসংখ্য প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, এসব কিছু কি একজন জ্ঞানবান সত্তার পরিকল্পনা ও সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা এবং প্রবল শক্তি ও সংকল্প ছাড়াই আপনা আপনি হয়ে যেতে পারে? আর এ ধরনের আকস্মিক ঘটনা কি অনবরত হাজার বছর বরং লাখো কোটি বছর ধরে যথা নিয়মে ঘটে যাওয়া সম্ভবপর? প্রবল আক্রোস ও বিদ্বেষে অন্ধ একজন চরম হঠকারী ব্যক্তিই কেবল একে একটি আকস্মিক ঘটনা বলতে পারে। কোন সত্য প্রিয় বুদ্ধি ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের অযৌক্তিক ও অর্থহীন দাবী করা এবং তা মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

৭৪. পৃথিবী যে, অজস্র ধরনের বিচিত্র সৃষ্টির আবাসস্থল ও অবস্থান স্থল হয়েছে এটাও কোন সহজ ব্যাপার নয়। যে বৈজ্ঞানিক সমতা ও সামঞ্জস্যশীলতার মাধ্যমে এ গ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিষয়াবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে মানুষ বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারে না। সে অনুভব করতে থাকে, এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা একজন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এ ভূ–গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলছে। কারো ওপর ভর দিয়ে অবস্থান করছে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এর মধ্যে কোন কম্পন ও অস্থিরতা নেই। পৃথিবীর কোথাও মাঝে মধ্যে সীমিত পর্যায়ে ভূমিকম্প হলে তার যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের

সামনে আসে তাতে গোটা পৃথিবী যদি কোন কম্পন বা দোদুল্যমানতার শিকার হতো তাহলে এখনো মানব বসতি সম্ভবপর হতো না। এ গ্রহটি নিয়মিতভাবে সূর্যের সামনে আসে আবার পেছন ফেরে। এর ফলে দিনরাতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি এর একটি দিক সব সময় সূর্যের দিকে ফেরানো থাকতো এবং অন্য দিকটা সব সময় থাকতো আড়ালে তাহলে এখানে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারতো না। কারণ একদিকের সার্বক্ষণিক শৈত্য ও আলোকহীনতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মলাভের উপযোগী হতো না এবং অন্যদিকের ভয়াবহ দাবদাহ প্রচণ্ড উত্তাপ তাকে পানিহীন, উদ্ভিদহীন ও প্রাণীহীন করে দিতো। এ ভূ–মণ্ডলের পাঁচশো মাইল উপর পর্যন্ত বাতাসের একটি পুরু স্তর দিয়ে ঢেকে দয়া হয়েছে। উল্কা পতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে তা পৃথিবীকে রক্ষা করে। অন্যথায় প্রতিদিন কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড সেকেণ্ডে ৩০ মাইল বেগে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানতো। ফলে এখানে যে ধ্বংস লীলা চলতো তাতে মানুষ, পশু–পাখি, গাছ–পালা কিছুই জীবিত থাকতো না। এ বাতাসই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সমুদ্র থেকে মেঘ উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের জীবনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের যোগান দেয়। এ বাতাস না হলে এ পৃথিবী কোন বসতির উপযোগী অবস্থান স্থলে পরিণত হতে পারতো না। এ ভূ–মণ্ডলের ভূ–ত্বকের কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গায় খনিজ ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত করা হয়েছে। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। যেখানে এ জিনিসগুলো থাকে না সেখানকার ভূমি জীবন ধারনের উপযোগী হয় না। এ গ্রহটিতে সাগর, নদী, হ্রদ, ঝরণা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতধারার আকারে বিপুল পরিমাণ পানির ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। পাহাড়ের ওপরও এর বিরাট ভাণ্ডার ঘনীভূত করে এবং পরে তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ছাড়া এখানে জীবনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আবার এ পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যেসব জিনিস পাওয়া যায় সেগুলোকে একত্র করে রাখার জন্য এ গ্রহটিতে অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যাকর্ষণ (Granitation) সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ মধ্যাকর্ষণ যদি কম হতো, তাহলে বাতাস ও পানি উভয়কে এখানে আটকে রাখা সম্ভব হতো না এবং তাপমাত্রা এত বেশী বেড়ে যেতো যে, জীবনের টিকে থাকা এখানে কঠিন হয়ে উঠতো। এ মধ্যাকর্ষণ যদি বেশী হতো, তাহলে বাতাস অনেক বেশী ঘন হয়ে যেতো, তার চাপ অনেক বেশী বেড়ে যেতো এবং জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হওয়া কঠিন হয়ে পড়তো ফলে বৃষ্টি হতো না, ঠাণ্ডা বেড়ে যেতো, ভূ–পৃষ্টের খুব কম এলাকাই বাসযোগ্য হতো বরং ভারীত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ–প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের ওজন এত বেড়ে যেতো যে তাদের পক্ষে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে যেতো। তাছাড়া এ গ্রহটিকে সূর্য থেকে জনবসতির সবচেয়ে উপযোগী একটি বিশেষ দূরত্বে রাখা হয়েছে। যদি এর দূরত্ব বেশী হতো, তাহলে সূর্য থেকে সে কম উত্তাপ লাভ করতো, শীত অনেক বেশী হতো, এবং অন্যান্য অনেক জিনিস মিলেমিশে পৃথিবী নামের এ গ্রহটি আর মানুষের মতো সৃষ্টির বসবাসের উপযোগী থাকতো না।

এ গুলো হচ্ছে বাসোপযোগিতার কয়েকটি দিক মাত্র। এগুলোর বদৌলতে ভূ–পৃষ্ঠ তার বর্তমান মানব প্রজাতির জন্য অবস্থান স্থলে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই এসব বিষয় সামনে রেখে চিন্তাভাবনা করলে এক মুহূর্তের জন্যও একথা ভাবতে পারে না যে, কোন পূর্ণ জ্ঞানময় স্রষ্টার পরিকল্পনা ছাড়া এসব উপযোগিতা ও ভারসাম্য নিছক

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শোনেন যখন সে তাঁকে ডাকে কাতরভাবে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন?[৭৬] আর (কে) তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন?[৭৭] আল্লাহর সাথে কি আর কোন ইলাহও কি (একাজ করছে)? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো। আর কে জল-স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান[৭৮] এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান?[৭৯] আল্লাহর সাথে কি অন্য ইলাহও (একাজ করে)? আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে এ শির্‌ক থেকে যা এরা করে।

আর তিনি কে যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর আবার এর পুনরাবৃত্তি করেন?[৮০] আর কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে?[৮১] আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহও কি (একাজে অংশীদার) আছে? বলো, আনো তোমাদের যুক্তি, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৮২]

একটি আকস্মিক ঘটনার ফলে আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং একথাও ধারণা করতে পারে না যে, এ মহা সৃষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং একে বাস্তব রূপদান করার ব্যাপারে কোন দেব-দেবী বা জিন অথবা নবী-ওলী কিংবা ফেরেশতার কোন হাত আছে।

৭৫. অর্থাৎ মিঠা ও নোনা পানির ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডার এ পৃথিবীতেই রয়েছে কিন্তু তারা কখনো পরস্পর মিশে যায় না। ভূ-গর্ভের পানির স্রোতও কখনো একই এলাকায় মিঠা পানির স্রোত আলাদা এবং নোনা পানির স্রোত আলাদা দেখা যায়। নোনা পানির সাগরেও দেখা যায় কোথাও মিঠা পানির স্রোত আলাদা প্রবাহিত হচ্ছে। সাগর যাত্রীরা সেখান থেকে তাদের খাবার পানি সংগ্রহ করেন। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ৬৮ টীকা)

৭৬. আরবের মুশরিকরা ভালোভাবেই জানে এবং স্বীকারও করে যে, একমাত্র আল্লাহই বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করেন। তাই কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যখন তোমরা কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হও তখন আল্লাহরই কাছে ফরিয়াদ করতে থাকো কিন্তু যখন সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতে থাকো। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সরা আল আন'আম, ২৯-৪১ টীকা, সূরা ইউনুস ২১-২২ আয়াত, ও ৩১ টীকা, সূরা আন্ নাহল ৪৬ টীকা, সূরা বনী ইসরাঈল ৮৪ টীকা) এ বিষয়টি কেবল আরব মুশরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সারা দুনিয়ার মুশরিকদেরও সাধারণভাবে এ একই অবস্থা। এমনকি রাশিয়ার নাস্তিকরা যারা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার বিরুদ্ধে যথারীতি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তারাও যখন বিগত বিশ্ব মহাযুদ্ধে জার্মান সেনাদলের অবরোধ কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখন তারা আল্লাহকে ডাকার প্রয়োজন অনুভব করেছিল।

৭৭. এর দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, এক প্রজন্মের পর আর এক প্রজন্মকে এবং এক জাতির পর আর এক জাতির উত্থান ঘটান। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার এবং এখানে রাজত্ব করার ক্ষমতা দেন।

৭৮. অর্থাৎ যিনি তারকার সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যার ফলে তোমরা রাতের অন্ধকারেও নিজেদের পথের সন্ধান করতে পারো। মানুষ জলে-স্থলে যেসব সফর করে, সেখানে তাকে পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার সাহায্যে সে নিজের গন্তব্য স্থলের দিকে নিজের চলার পথ নির্ধারণ করে নিতে পারে। দিনে ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন আলামত এবং সূর্যের উদয়াস্তের দিক তাকে সাহায্য করে এবং অন্ধকার রাতে আকাশের তারকারা তাকে পথ দেখায়। এ সবই আল্লাহর জ্ঞানগর্ভ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ। সূরা নাহলে এসবগুলোকে আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

وَعَلٰمٰتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ (ايت : ١٦)

৭৯. রহমত বা অনুগ্রহ বলতে বৃষ্টিধারা বুঝানো হয়েছে। এর আগমনের পূর্বে বাতাস এর আগমনী সংবাদ দেয়।

৮০. একটি সহজ সরল কথা। একটি বাক্যে কথাটি বলে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এত বেশী খুটিনাটি বিষয় রয়েছে যে, মানুষ এর যত গভীরে নেমে যেতে থাকে ততই আল্লাহর অস্তিত্ব ও আল্লাহর একত্বের প্রমাণ সে লাভ করে যেতে থাকে। প্রথমে সৃষ্টি কর্মটিই দেখা যাক। জীবনের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেমন করে হয়, মানুষের জ্ঞান আজো এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। নির্জীব বস্তুর নিছক রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে প্রাণের স্বতস্ফূর্ত উন্মেষ ঘটতে পারে না, এ পর্যন্ত এটিই সর্বস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাণ সৃষ্টির জন্য যতগুলো উপাদানের প্রয়োজন সে সবগুলো যথাযথ আনুপাতিক হারে একেবারে আকস্মিকভাবে একত্র হয়ে গিয়ে আপনা আপনি জীবনের উন্মেষ ঘটে যাওয়া অবশ্যই নাস্তিক্যবাদীদের একটি অ-তাত্মিক কল্পনা। কিন্তু যদি অংকশাস্ত্রের আকস্মিক ঘটনার নিয়ম (Law of chance) এর ওপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিতে

বিজ্ঞান গবেষণাগারসমূহে (Laboratories) নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে প্রাণবান বস্তু সৃষ্টি করার যতগুলো প্রচেষ্টাই চলেছে, সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও তা সবই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। বড় জোর যা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তা হচ্ছে কেবলমাত্র এমন বস্তু যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় D. N. A. বলা হয়। এটি এমন বস্তু যা জীবিত কোষসমূহে পাওয়া যায়। এটি অবশ্যই জীবনের উপাদান কিন্তু নিজে জীবন্ত নয়। জীবন আজো একটি অলৌকিক ব্যাপার। এটি একজন স্রষ্টার হুকুম, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ফল, এছাড়া এর আর কোন তাত্বিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না।

এরপর সামনের দিকে দেখা যাক। জীবন নিছক একটি একক অমিশ্রিত অবস্থায় নেই বরং অসংখ্য বিচিত্র আকৃতিতে তাকে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাণীর মধ্যে প্রায় দশ লাখ এবং উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় দু'লাখ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ লাখো লাখো প্রজাতি নিজেদের আকার-আকৃতি ও শ্রেণী বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে এত সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত পার্থক্যের অধিকারী এবং জানা ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ থেকে তারা নিজেদের পৃথক শ্রেণী আকৃতিকে অনবরত এমনভাবে অক্ষুন্ন রেখে আসছে যার ফলে এক আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনা (Design) ছাড়া জীবনের এ মহা বৈচিত্রের অন্য কোন যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা করা কোন ডারউইনের পক্ষেই সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত কোথাও দু'টি প্রজাতির মাঝখানে এমন এক শ্রেণীর জীব পাওয়া যায়নি যারা এক প্রজাতির কাঠামো, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট ভেদ করে বের হয়ে এসেছে এবং এখনো অন্য প্রজাতির কাঠামো, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট পর্যন্ত পৌছুবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কংকালের (Fossils) সমগ্র বিবরণীতে এ পর্যন্ত এর কোন নজির পাওয়া যায়নি এবং বর্তমান প্রাণী জগতে কোথাও এ ধরনের 'হিজড়া' শ্রেণী পাওয়া কঠিন। আজ পর্যন্ত সর্বত্রই সকল প্রজাতির সদস্যকেই তার পূর্ণ শ্রেণীগত বৈশিষ্ট সহকারেই পাওয়া গেছে। মাঝে-মধ্যে কোন হারিয়ে যাওয়া শ্রেণী সম্পর্কে যেসব কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়, কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়ে তার অসারতা ফাঁস করে দেয়। বর্তমানে এটি একটি অকাট্য সত্য যে, একজন সুবিজ্ঞ কারিগর, একজন সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা ও চিত্রকরই জীবনকে এত সব বৈচিত্রময় রূপদান করেছেন।

এ তো গেলো সৃষ্টির প্রথম অবস্থার কথা। এবার সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির কথাটা একবার চিন্তা করা যাক। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠনাকৃতি ও গঠন প্রণালীর মধ্যে এমন বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি (Mechanism) রেখে দিয়েছেন যা তার অসংখ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে ঠিক একই শ্রেণীর আকৃতি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট সম্পন্ন হাজারো প্রজন্মের জন্ম দিয়ে যেতে থাকে। কখনো মিছামিছিও এ কোটি কোটি ছোট ছোট কারখানায় এ ধরনের ভুলচুক হয় না, যার ফলে একটি প্রজাতির কোন বংশ বৃদ্ধি কারখানায় অন্য প্রজাতির কোন নমুনা উৎপাদন করতে থাকে। আধুনিক বংশ তত্ব (Genetics) পর্যবেক্ষণ এ ব্যাপারে বিস্ময়কর সত্য উদ্ঘাটন করে। প্রত্যেকটি চারাগাছের মধ্যে এমন যোগ্যতা রাখা হয়েছে যার ফলে সে তার নিজের প্রজন্মকে পরবর্তী বংশধরদের পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এমন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে যাতে পরবর্তী বংশধররা তার যাবতীয় প্রজাতিক বৈশিষ্ট, আচরণ ও গুণের অধিকারী হয় এবং তার প্রত্যেক ব্যক্তি সত্তাই অন্যান্য সকল প্রজাতির ব্যক্তিবর্গ থেকে শ্রেণীগত বিশিষ্টতা অর্জন করে। এ প্রজাতি ও প্রজন্ম রক্ষার সরঞ্জাম প্রত্যেকটি চারার প্রতিটি কোষের (Cell) একটি অংশে

সংরক্ষিত থাকে। অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একে দেখা যেতে পারে। এ ক্ষুদ্র প্রকৌশলীটি পূর্ণ সুস্থতা সহকারে চারার সার্বিক বিকাশকে চূড়ান্তভাবে তার শ্রেণীগত আকৃতির স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করে। এরি বদৌলতে একটি গম বীজ থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে যেখানেই যত গমের চারা উৎপন্ন হয়েছে তা সব গমই উৎপাদন করেছে। কোন আবহাওয়ায় এবং কোন পরিবেশে কখনো ঘটনাক্রমে একটি গম বীজের বংশ থেকে একটি যব উৎপন্ন হয়নি। মানুষ ও পশুর ব্যাপারেও এই একই কথা। অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে কারো সৃষ্টিই একবার হয়েই থেমে যায়নি। বরং কল্পনাতীত ব্যাপকতা নিয়ে সর্বত্র সৃষ্টির পুনরাবর্তনের একটি বিশাল কারখানা সক্রিয় রয়েছে। এ কারখানা অনবরত প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে একই শ্রেণীর অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎপাদন করে চলছে। যদি কোন ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের এ অণুবীক্ষণীয় বীজটি দেখে, যা সকল প্রকার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীকে নিজের ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বেরও নিছক একটি অংশে ধারণ করে থাকে এবং তারপর দেখে অংগ প্রত্যংগের এমন একটি চরম নাজুক ও জটিল ব্যবস্থা এবং চরম সূক্ষ্ম ও জটিল কর্মধারা (Progresses), যার সাহায্যে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তির বংশধারার বীজ একই শ্রেণীর নবতর ব্যক্তিকে উৎপন্ন করে, তাহলে একথা সে এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারে না যে, এমন নাজুক ও জটিল কর্মব্যবস্থা কখনো আপনা আপনি গড়ে উঠতে পারে, এবং তারপর বিভিন্ন শ্রেণীর শত শত কোটি ব্যক্তির মধ্যে তা আপনা আপনি যথাযথভাবে চালুও থাকতে পারে। এ জিনিসটি কেবল নিজের সূচনার জন্যই একজন বিজ্ঞ স্রষ্টা চায় না বরং প্রতি মুহূর্তে নিজের সঠিক ও নির্ভুল পথে চলতে থাকার জন্যও একজন পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার প্রত্যাশী হয়, যিনি এক মুহূর্তের জন্যও এ কারখানাগুলোর দেখা-শুনা, রক্ষণা-বেক্ষণ ও সঠিক পথে পরিচালনা থেকে গাফিল থাকবেন না।

এ সত্যগুলো যেমন একজন নাস্তিকের আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রবণতার মূলোচ্ছেদ করে তেমনি একজন মুশরিকের শির্‌ককেও সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। এমন কোন নির্বোধ আছে কি যে একথা ধারণা করতে পারে যে, আল্লাহর বিশ্ব পরিচালনার এ কাজে কোন ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলী সামান্যতমও অংশীদার হতে পারে? আর কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিদ্বেষ ও স্বার্থশূন্য মনে একথা বলতে পারে যে, এ সমগ্র সৃষ্টি কারখানা ও সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি এ ধরনের পরিপূর্ণ বিজ্ঞতা ও নিয়ম-শৃংখলা সহকারে ঘটনাক্রমেই শুরু হয় এবং আপনা আপনিই চলছে?

৮১. এ সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোকে অগভীরভাবে পড়ে কোন ব্যক্তি রিযিক দেবার ব্যাপারটি যেমন সহজ সরল ভাবে অনুভব করে আসলে ব্যাপার কিন্তু তেমন সহজ সরল নয়। এ পৃথিবীতে পশু ও উদ্ভিদের লাখো লাখো শ্রেণী পাওয়া যায়। তাদের প্রত্যেকের সংখ্যা শত শত কোটি হবে এবং তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা খাদ্যের প্রয়োজন। স্রষ্টা তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্যবস্তু এত বিপুল পরিমাণে এবং প্রত্যেকের আহরণ ক্ষমতার এত কাছাকাছি রেখে দিয়েছেন যার ফলে কোন শ্রেণীর কোন একজনও খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। তারপর এ ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী ও আকাশের এত বিচিত্র শক্তি মিলেমিশে কাজ করে যাদের সংখ্যা গণনা করা কঠিন। তাপ, আলো, বাতাস, পানি ও মাটির বিভিন্ন

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

তাদেরকে বলো, আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে ও আকাশে কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।[৮৩] এবং তারা জানে না ক'বে তাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে[৮৪] বরং আখেরাতের জ্ঞানই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। উপরন্তু তারা সে ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। আসলে তারা সে ব্যাপারে অন্ধ।[৮৫]

উপাদানের মধ্যে যদি ঠিকমতো আনুপাতিক হারে সহযোগিতা না থাকে তাহলে এক বিন্দু পরিমাণ খাদ্যও উৎপন্ন হতে পারে না।

কে কল্পনা করতে পারে, এ বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা একজন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া এমনিই ঘটনাক্রমে হতে পারে? এবং বুদ্ধি সচেতন অবস্থায় কে একথা চিন্তা করতে পারে যে, এ ব্যবস্থাপনায় কোন জিন, ফেরেশতা বা কোন মহা মনীষীর আত্মার কোন হাত আছে?

৮২. অর্থাৎ এসব কাজে সত্যিই অন্য কেউ শরীক আছে, এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আনো অথবা যদি তা না পারো তাহলে কোন যুক্তিসংগত প্রমাণের সাহায্যে একথা বুঝিয়ে দাও যে, এ সমস্ত কাজ তো একমাত্র আল্লাহরই কিন্তু বন্দেগী ও উপাসনা লাভের অধিকার লাভ করবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ অথবা তাঁর সাথে অন্যজনও।

৮৩. উপরে সৃষ্টিকর্ম, ব্যবস্থাপনা ও জীবিকাদানের দিক দিয়ে এই মর্মে যুক্তি পেশ করা হয়েছিল যে, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ (অর্থাৎ একমাত্র ইলাহ ও ইবাদাত লাভের একমাত্র অধিকারী) এবার আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ অর্থাৎ জ্ঞানের দিক দিয়ে জানানো হচ্ছে যে, এ ব্যাপারেও মহান আল্লাহ হচ্ছেন লা–শরীক। পৃথিবী ও আকাশে ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া অথবা মানুষ ও অ–মানুষ যে কোন সৃষ্টি হোক না কেন সবারই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিছু না কিছু জিনিস সবার কাছ থেকে গোপন রয়েছে। সব কিছুর জ্ঞান যদি কারো থাকে তাহলে তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহানের কোন জিনিস এবং কোন কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছু জানেন।

এখানে মূলে "গায়েব" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। গায়েব মানে প্রচ্ছন্ন লুকানো অদৃশ্য বা আবৃত। পারিভাষিক অর্থে গায়েব হচ্ছে এমন জিনিস যা অজানা এবং যাকে জানার উপায়–উপকরণগুলো দ্বারা আয়ত্ব করা যায় না। দুনিয়ায় এমন বহু জিনিস আছে যা এককভাবে কোন কোন লোক জানে এবং কোন কোন লোক জানে না। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যা সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানব জাতি কখনো জানতো না, আজকেও

জানে না এবং ভবিষ্যতেও কখনো জানবে না। জিন, ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টির ব্যাপারেও এই একই কথা। কতক জিনিস তাদের কারো কাছে প্রচ্ছন্ন এবং কারো কাছে প্রকাশিত। আবার অসংখ্য জিনিস এমন আছে যা তাদের সবার কাছে প্রচ্ছন্ন ও অজানা। এ সব ধরনের অদৃশ্য জিনিস একমাত্র একজনের কাছে দৃশ্যমান। তিনি হচ্ছেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তাঁর কাছে কোন জিনিস অদৃশ্য নয়। সবকিছুই তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান।

উপরে বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক এবং খাদ্য যোগানদাতা হিসেবে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য প্রশ্নের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য বর্ণনা করার জন্য সে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, পূর্বোক্ত গুণগুলো প্রত্যেকটি মানুষ দেখছে, সেগুলোর চিহ্ন একদম সুস্পষ্ট। কাফের ও মুশরিকরাও সেগুলো সম্পর্কে আগেও একথা মানতো এবং এখনো মানে যে, এসব একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাই সেখানে যুক্তি প্রদানের পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ এ সমস্ত কাজ যখন আল্লাহরই এবং তাদের কেউ যখন এ সব কাজে তাঁর অংশীদার নয়, তখন তোমরা কেমন করে সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অন্যদেরকে অংশীদার করে নিয়েছো এবং কিসের ভিত্তিতেই বা তারা ইবাদাত লাভের অধিকারী হয়ে গেছে? কিন্তু আল্লাহর সর্বজ্ঞতা সংক্রান্ত গুণটির এমন কোন অনুভব যোগ্য আলামত নেই, যা আংগুল দিয়ে দেখানো যায়। এ বিষয়টি শুধুমাত্র চিন্তা–ভাবনা করেই বুঝতে পারা যেতে পারে। তাই একে প্রশ্নের পরিবর্তে দাবী আকারে পেশ করা হয়েছে। এখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির একথা ভেবে দেখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে এ কথা কি বোধগম্য? অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানে যেসব অবস্থা, বস্তু ও সত্য কখনো ছিল বা এখন আছে কিংবা ভবিষ্যতে হবে, সেগুলো কি আল্লাহ চাড়া অন্য কারো জানা সম্ভব। আর যদি অন্য কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী না হয়ে থাকে এবং সে জ্ঞান লাভের ক্ষমতা ও যোগ্যতা আর কারো না থেকে থাকে তাহলে যারা প্রকৃত সত্য ও অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নয় তাদের মধ্য থেকে কেউ বান্দাদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অভাব মোচনকারী ও সংকট নিরসনকারী হতে পারে, একথা কি বুদ্ধি সম্মত?

ইবাদাত–উপাসনা ও সার্বভৌম কতৃত্বের অধিকারী হওয়া এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যার ভেতরেই উপাস্য বা দেবতা বা বিশ্ববিধাতা সুলভ সর্বময় কর্তৃত্বের কোন গন্ধ ও অনুমান করেছে তার সম্পর্কে একথা অবশ্যই ভেবেছে যে, তার কাছে সবকিছুই সুস্পষ্ট ও আলোকিত এবং কোন জিনিস তার অগোচরে নেই। অর্থাৎ মানুষের মন এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে জানে যে, ভাগ্যের ভাংগা–গড়া, ফরিয়াদ শোনা, প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করা কেবলমাত্র এমন এক সত্তার কাজ হতে পারে যিনি সব কিছু জানেন এবং যার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। এ কারণে তো মানুষ যাকেই সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পন্ন মনে করে তাকে অবশ্যই অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারীও মনে করে। কারণ তার বুদ্ধি নিসন্দেহে সাক্ষ দেয়, জ্ঞান ও ক্ষমতা পরস্পর অংগাংগীভাবে সম্পর্কিত একটির জন্য অন্যটি অনিবার্য। এখন যদি এটি সত্য হয়ে থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও রিযিকদাতা নেই, যেমন উপরের আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে সাথে সাথে এটিও সত্য যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তা অদৃশ্য

জ্ঞানের অধিকারীও নয়। কোন্ বুদ্ধি সচেতন ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারে যে, কোন ফেরেশতা, জিন, নবী, অলী বা কোন সৃষ্টি সাগরের বুকে, বাতাসের মধ্যে এবং মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে ও তার উপরিভাগে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ প্রকারের কত প্রাণী আছে ? মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের সঠিক সংখ্যা কত তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কোন্ কোন্ ধরনের সৃষ্টি বিরাজ করছে এবং এ সৃষ্টিগুলোর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবস্থান কোথায় এবং তার প্রয়োজনসমূহ কি কি তা জানে? এসব কিছু আল্লাহর অপরিহার্যভাবে জানা থাকতে হবে। কারণ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকেই তাদের যাবতীয় ব্যাপার পরিচালনা এবং তাদের যাবতীয় অবস্থা দেখা-শুনা করতে হয় আর তিনিই তাদের জীবিকা সরবরাহকারী। কিন্তু অন্য কেউ তার নিজের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যে এই ব্যাপক ও সর্বময় জ্ঞান কেমন করে রাখতে পারে? সৃষ্টি ও জীবিকাদানের কর্মের সাথে তার কি কোন সম্পর্ক আছে যে, সে এসব জিনিস জানবে?

আবার অদৃশ্য জ্ঞানের গুণটি বিভাজ্যও নয়। উদাহরণস্বরূপ কেবলমাত্র পৃথিবীর সীমানা পর্যন্ত এবং শুধুমাত্র মানুষের ব্যাপারে কোন মানুষ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হবে-এটা সম্ভব নয়। আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, স্থিতিস্থাপক ও প্রতিপালক হওয়ার গুণগুলো যেমন বিভক্ত হতে পারে না। তেমনি এ গুণটিও বিভক্ত হতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নেবে মাতৃ জরায়ুতে গর্ভসঞ্চার হওয়ার সময় থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সবার সকল অবস্থা ও পরিস্থিতি জানতে পারে এমন মানুষটি কে হতে পারে? সে মানুষটি কেমন করে এবং কেন তা জানবে? সে কি এ সীমা সংখ্যাহীন সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা? সে কি তাদের পিতৃপুরুষদের বীর্যে তাদের বীজানু উৎপন্ন করেছিল? সে কি তাদের মাতৃগর্ভে তাদের আকৃতি নির্মাণ করেছিল? মাতৃগর্ভের সেই মাংসপিণ্ডটি জীবিত ভূমিষ্ট হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা কি সে করেছিল? সে কি তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য তৈরি করেছিল? সে কি তাদের জীবন-মৃত্যু, রোগ-স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, দারিদ্র ও উত্থান পতনের ফায়সালা করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল? এসব কাজ কবে থেকে তার দায়িত্বে এসেছে? তার নিজের জন্মের আগে, না পরে? আর কেবল মানুষের মধ্যে এ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হতে পারে কেমন করে? একাজ তো অনিবার্যভাবে পৃথিবী ও আকাশের বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। যে সত্তা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন তিনিই তো মানুষের জন্ম-মৃত্যু, তাদের জীবিকার সংকীর্ণতা ও স্বচ্ছলতার এবং তাদের ভাগ্যের ভাংগা গড়ার জন্য দায়িত্বশীল হতে পারেন।

তাই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নয়, এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান যতটুকু চান জ্ঞান দান করেন। কোন অদৃশ্য বা কতগুলো অদৃশ্য জিনিসকে তার সামনে উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু অদৃশ্য জ্ঞান সামগ্রিকভাবে কেউ লাভ করতে পারে না এবং "আলেমুল গায়েব" অদৃশ্য জ্ঞানী উপাধি একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ -

"আর তাঁর কাছেই আছে অদৃশ্যের চাবিগুলো, সেগুলো তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" (আন'আম ৫৯ আয়াত)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ -

"একমাত্র আল্লাহই রাখেন কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি (লালিত) হচ্ছে, কোন প্রাণী জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন প্রাণী জানে না কোন্ ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।" (লুকমান ৩৪ আয়াত)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ -

"তিনি জানেন যা কিছু সৃষ্টির সামনে আছে এবং যা কিছু আছে তাদের অগোচরে। আর তাঁর জ্ঞানের কিছুমাত্র অংশও তারা আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যে জিনিসটির জ্ঞান তাদেরকে দিতে চান, দেন।" (আল বাকারাহ ২৫৫ আয়াত)

কোন সৃষ্টি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে এ ধারণা কুরআন সর্বতোভাবে নাকচ করে দেয়। এমনকি বিশেষভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারেও এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন এবং তাঁকে অদৃশ্যের কেবলমাত্র ততটুকু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে যতটুকু রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন ছিল। সূরা আন'আম ৫০ আয়াত, সূরা আ'রাফ ১৮৭ আয়াত, সূরা তাওবাহ ১০১ আয়াত, সূরা হূদ ৩১ আয়াত, সূরা আহযাব ৬৩ আয়াত, সূরা আহকাফ ৯ আয়াত, সূরা তাহরীম ৩ আয়াত এবং সূরা জিন ২৬ আয়াত এ ব্যাপারে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের অবকাশই রাখেনি।

কুরআনের এ সমস্ত সুস্পষ্ট ভাষণ আলোচ্য আয়াতটির বক্তব্য সমর্থন ও ব্যাখ্যা করে এর পর এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা এবং যা কিছু আছে ও যা কিছু হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো আছে—একথা মনে করা পুরোপুরি একটি অনৈসলামী বিশ্বাস। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম নির্ভুল বর্ণনা পরম্পরায় হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ (اى النبى صلى الله عليه وسلم) يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ -

"যে ব্যক্তি দাবী করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগামী কাল কি হবে তা জানেন, সে আল্লাহর প্রতি মহা মিথ্যা আরোপ করে। কারণ আল্লাহ তো বলেন, হে নবী! তুমি বলে দাও আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।"

ইবনুল মুনযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) প্রখ্যাত শিষ্য হযরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, "হে মুহাম্মাদ! কিয়ামত কবে আসবে? আমাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় বৃষ্টি কবে হবে? আর আমার গর্ভবতী স্ত্রী ছেলে না মেয়ে প্রসব করবে? আর আজ আমি কি উপার্জন করেছি তাতো আমি জানি কিন্তু আগামীকাল আমি কি উপার্জন করবো? আর আমি কোথায় জন্মেছি তাতো আমি জানি কিন্তু আমি মরবো কোথায়?" এ প্রশ্নগুলোর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিপূর্বে আমাদের উল্লেখিত সূরা লুকমানের আয়াতটি শুনিয়ে দেন। এছাড়া বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের একটি বহুল পরিচিত হাদীসও এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ সাহাবীগণের সমাবেশে হযরত জিব্রীল মানুষের বেশে এসে নবীকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার একটি এও ছিল যে, কিয়ামত কবে হবে? নবী (সা) জবাব দিয়েছিলেন,

مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ –

"যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী জানে না।"

তারপর বলেন, এ পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এ সময় তিনি উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করেন।

৮৪. অর্থাৎ অন্যরা, যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তারা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং এ জন্য যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করে নিয়েছো, তারা নিজেরা তো নিজেদেরই ভবিষ্যতের খবর রাখে না। তারা জানে না, কিয়ামত কবে আসবে যখন আল্লাহ পুনর্বার তাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করাবেন।

৮৫. 'ইলাহ'র গুণাবলীর ব্যাপারে তাদের আকীদার মৌলিক ত্রুটিগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর এখন একথা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যে এ মারাত্মক গোমরাহীর মধ্যে পড়ে আছে এর কারণ এ নয় যে, চিন্তা–ভাবনা করার পর তারা কোন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে ভিন্ন সত্তাদের শরীকানা আছে। বরং এর আসল কারণ হচ্ছে, তারা কখনো গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করেনি। যেহেতু তারা আখেরাত সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে কিংবা তা থেকে চোখ বন্ধ করে রেখেছে, তাই আখেরাত চিন্তা থেকে বেপরোয়া ভাব তাদের মধ্যে পুরোপুরি একটি অ–দায়িত্বশীল মনোভাব সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা এ বিশ্ব–জাহান এবং নিজেদের জীবনের প্রকৃত সমস্যাবলীর প্রতি আদতে কোন গুরুত্বই আরোপ করে না। প্রকৃত সত্য কি এবং তাদের জীবন দর্শন তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে কিনা এর কোন পরোয়াই তারা করে না। কারণ তাদের মতে শেষ পর্যন্ত মুশরিক, নাস্তিক, একত্ববাদী ও সংশয়বাদী সবাইকেই মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতে হবে এবং কোন জিনিসেরই কোন চূড়ান্ত ফলাফল নেই।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾
لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৬ রুকূ’

এ অস্বীকারকারীরা বলে থাকে, "যখন আমরা ও আমাদের বাপ–দাদারা মাটি হয়ে যাবো তখন আমাদের সত্যিই কবর থেকে বের করা হবে নাকি? এ খবর আমাদেরও অনেক দেয়া হয়েছে এবং ইতিপূর্বে আমাদের বাপ দাদাদেরকেও অনেক দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এসব নিছক কল্প–কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা আগের জামানা থেকে শুনে আসছি।" বলো, পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখো অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে।[৮৬] *হে নবী! তাদের অবস্থার জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের* চক্রান্তের জন্য মনঃক্ষুন্নও হয়ো না।[৮৭]

আখেরাত সংক্রান্ত এ বক্তব্যটি এর আগের আয়াতের নিম্নোক্ত বাক্যাংশ থেকে বের হয়েছে ঃ "তারা জানে না, কবে তাদেরকে উঠানো হবে।" এ বাক্যাংশে একথা বলে দেয়া হয়েছিল যে, যাদেরকে উপাস্য করা হয়—আর ফেরেশ্‌তা, জিন, নবী, অলী সবাই এর অন্তরভুক্ত—তাদের কেউই আখেরাত কবে আসবে জানে না। এরপর এখন সাধারণ কাফের ও মুশরিকদের সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত আখেরাত কোনদিন আদৌ হবে কিনা তা তারা জানেই না। দ্বিতীয়ত তাদের এ অজ্ঞতা এ জন্য নয় যে, তাদেরকে কখনো এ ব্যাপারে জানানো হয়নি। বরং এর কারণ হচ্ছে, তাদেরকে যে খবর দেয়া হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করেনি বরং তার নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে থেকেছে। তৃতীয়ত আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তারা কখনো সেগুলো যাচাই করার প্রয়াস চালায়নি। বরং তারা সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করে থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

৮৬. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে আখেরাতের পক্ষে দু’টি মোক্ষম যুক্তি রয়েছে এবং উপদেশও।

প্রথম যুক্তিটি হচ্ছে, দুনিয়ার যেসব জাতি আখেরাতকে উপেক্ষা করেছে তারা অপরাধী না হয়ে পারেনি। তারা দায়িত্ব জ্ঞান বর্জিত হয়ে গেছে। জুলুম নির্যাতনে অভ্যস্ত হয়েছে। ফাসেকী ও অশ্লীল কাজের মধ্যে ডুবে গেছে। নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট হবার ফলে শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি মানুষের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। দুনিয়ার

দিকে দিকে বিধ্বস্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষগুলো এর সাক্ষ দিচ্ছে। এগুলো পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, আখেরাত মানা ও না মানার সাথে মানুষের মনোভাব ও কর্মনীতি সঠিক কিনা, তার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাকে মেনে নিলে এ মনোভাব ও কর্মনীতি সঠিক থাকে এবং তাকে না মানলে তা ভুল ও অশুদ্ধ হয়ে যায়। একে মেনে নেয়া যে প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল, এটি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ কারণে একে মেনে নিলেই মানুষের জীবন সঠিক পথে চলতে থাকে। আর একে অস্বীকার করলে প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করাই হয়। ফলে রেলগাড়ি তার বাঁধানো রেলপথ থেকে নেমে পড়ে।

দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে, ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অপরাধীর কাঠগড়ায় প্রবেশকারী জাতিসমূহের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এ চিরায়ত সত্যটিই প্রকাশ করছে যে, এ বিশ্ব–জাহানে চেতনাহীন শক্তিসমূহের অন্ধ ও বধির শাসন চলছে না বরং এটি বিজ্ঞ ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা, যার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে একটি অভ্রান্ত প্রতিদান ও প্রতিবিধানমূলক আইন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ওপর পুরোপুরি নৈতিকতার ভিত্তিতে সে তার শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। কোন জাতিকে এখানে অসৎ কাজ করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় না। একবার কোন জাতির উথান হবার পর সে এখানে চিরকাল আয়েশ আরাম করত্রে থাকবে এবং অবাধে জুলুম নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকবে এমন ব্যবস্থা এখানে নেই। বরং একটি বিশেষ সীমায় পৌছে যাবার পর একটি মহা শক্তিশালী হাত এগিয়ে এসে তাকে পাকড়াও করে লাঞ্ছনা ও অপমানের গভীরতম গহ্বরে নিক্ষেপ করে। যে ব্যক্তি এ সত্যটি অনুধাবন করবে সে কখনো এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এ প্রতিদান ও প্রতিবিধানের আইনই এ দুনিয়ার জীবনের পরে অন্য একটি জীবনের দাবী করে। সেখানে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিসমূহ এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব মানবতার প্রতি ইনসাফ করা হবে। কারণ শুধুমাত্র একটি জালেম জাতি ধ্বংস হয়ে গেলেই ইনসাফের সমস্ত দাবী পূর্ণ হয়ে যায় না। এর ফলে যেসব মজলুমের লাশের ওপর সে তার মর্যাদার প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল তাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান হয় না। ধ্বংস আসার পূর্বে যেসব জালেম লাগামহীন জীবন উপভোগ করে গেছে তারাও কোন শাস্তি পায় না। যেসব দুষ্কৃতকারী বংশ পরম্পরায় নিজেদের পরে আগত প্রজন্মের জন্য বিভ্রান্তি ও ব্যভিচারের উত্তরাধিকার রেখে চলে গিয়েছিল তাদের সে সব অসৎকাজেরও কোন জবাবদিহি হয় না। দুনিয়ায় আযাব পাঠিয়ে শুধুমাত্র তাদের শেষ বংশধরদের আরো বেশী জুলুম করার সূত্রটি ছিন্ন করা হয়েছিল। আদালতের আসল কাজ তো এখনো হয়ইনি। প্রত্যেক জালেমকে তার জুলুমের প্রতিদান দিতে হবে। প্রত্যেক মজলুমের প্রতি জুলুমের ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তাকে তার ক্ষতিপূরণ করে দিতে হবে। আর যেসব লোক অসৎকাজের এ দুর্বার স্রোতের মোকাবিলায় ন্যায়, সত্য ও সততার পথে অবিচল থেকে সৎকাজ করার জন্য সর্বক্ষণ তৎপর থেকেছে এবং সারাজীবন এপথে কষ্ট সহ্য করেছে তাদেরকে পুরস্কার দিতে হবে। অপরিহার্যভাবে এসব কাজ কোন এক সময় হতেই হবে। কারণ দুনিয়ায় প্রতিদান ও প্রতিবিধান আইনের নিরবিচ্ছিন্ন কার্যকারিতা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষের কার্যাবলীকে তার নৈতিক মূল্যমানের ভিত্তিতে ওজন করা এবং পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করাই বিশ্ব পরিচালনার চিরন্তন রীতি ও পদ্ধতি।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ
رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ
مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

—তারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে এ হুমকি কবে সত্য হবে?"[৮৮] বলো বিচিত্র কি যে, আযাবের ব্যাপারে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো তার একটি অংশ তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।[৮৯] আসলে তোমার রব তো মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর গুযারী করে না।[৯০] নিসন্দেহে তোমার রব ভালোভাবেই জানেন যা কিছু তাদের অন্তর নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।[৯১] আকাশ ও পৃথিবীর এমন কোন গোপন জিনিস নেই যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আকারে নেই।[৯২]

এ দু'টি যুক্তির সাথে সাথে আলোচ্য আয়াতে আরো একটি উপদেশ রয়েছে। সেটি এই যে, পূর্ববর্তী অপরাধীদের পরিণতি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং আখেরাত অস্বীকার করার যে নির্বোধসূলভ বিশ্বাস তাদেরকে অপরাধীতে পরিণত করেছিল তার ওপর টিকে থাকার চেষ্টা করো না।

৮৭. অর্থাৎ তুমি তোমার বুঝাবার দায়িত্ব পালন করেছো। এখন যদি তারা না মেনে নেয় এবং নিজেদের নির্বোধসূলভ কর্মকাণ্ডের ওপর জিদ ধরে আল্লাহর আযাবের ভাগী হতে চায়, তাহলে অনর্থক তাদের অবস্থার জন্য হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত করে নিজেকে কষ্ট দাও কেন। আবার তারা সত্যের সাথে লড়াই এবং তোমার সংশোধন প্রচেষ্টাবলীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যেসব হীন চক্রান্ত করছে সেজন্য তোমার মনঃকষ্ট পাবার কোন কারণ নেই। তোমার পেছনে আছে আল্লাহর শক্তি। তারা তোমার কথা না মানলে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৮৮. উপরের আয়াতের মধ্যে যে হুমকি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এর অর্থ ছিল এই যে, এ আয়াতে পরোক্ষভাবে আমাদের শাস্তি দেবার যে কথা বলা হচ্ছে, তা কবে কার্যকর হবে? আমরা তো তোমার আহবান প্রত্যাখ্যান করেছি এবং তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তাহলে এখন আমাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না কেন?

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

যথার্থই এ কুরআন বনী ইসরাঈলকে বেশির ভাগ এমন সব কথার স্বরূপ বর্ণনা করে যেগুলোতে তারা মতভেদ করে।[৯৩] আর এ হচ্ছে পথ নির্দেশনা ও রহমত মু'মিনদের জন্য।[৯৪] নিশ্চয়ই (এভাবে) তোমার রব তাদের মধ্যেও[৯৫] নিজের হুকুমের মাধ্যমে ফায়সালা করে দেবেন, তিনি পরাক্রমশালী ও সবকিছু জানেন।[৯৬] কাজেই হে নবী! আল্লাহর উপর ভরসা করো, নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো। তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না।[৯৭] যেসব বধির পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে নিজের আহবান পৌঁছাতে পারো না[৯৮] এবং অন্ধদেরকে পথ বাতলে দিয়ে বিপথগামী হওয়া থেকে বাঁচাতে পারো না।[৯৯] তুমি তো নিজের কথা তাদেরকে শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং তারপর অনুগত হয়ে যায়।

৮৯. এটি একটি রাজসিক বাকভংগীমা। সর্বশক্তিমানের বাণীর মধ্যে যখন "সম্ভবত", "বিচিত্র কি" এবং "অসম্ভব কি" ধরনের শব্দাবলী এসে যায় তখন তার মধ্যে সন্দেহের কোন অর্থ থাকে না বরং তার মাধ্যমে একটি বেপরোয়া ভাব ফুটে ওঠে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি এতই প্রবল ও প্রচণ্ড যে, তাঁর কোন জিনিস চাওয়া এবং তা হয়ে যাওয়া যেন একই ব্যাপার। তিনি কোন কাজ করতে চান এবং তা করা সম্ভব হলো না এমন কোন কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না। এজন্য তাঁর পক্ষে "এমন হওয়া বিচিত্র কি" বলা এ অর্থ প্রকাশ করে যে, যদি তোমরা সোজা না হও তাহলে এমনটি হবেই। সামান্য একজন দারোগাও যদি পল্লীর কোন অধিবাসীকে বলে তোমার দুর্ভাগ্য হাতছানি দিচ্ছে। তাহলে তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি কাউকে বলেন, তোমার দুঃসময় তেমন দূরে নয়, তাহলে এরপরও সে কিভাবে নির্ভয়ে দিন কাটায়।

৯০. অর্থাৎ লোকেরা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন না বরং তাদের সামলে নেবার সুযোগ দেন, এটা তো রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ।

কিন্তু অধিকাংশ লোক এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এ সুযোগ ও অবকাশকে নিজেদের সংশোধনের জন্য ব্যবহার করে না। বরং পাকড়াও হতে দেরী হচ্ছে দেখে মনে করে এখানে কোন পাকড়াওকারী নেই, কাজেই যা মন চায় করে যেতে থাকো এবং যে বুঝাতে চায় তার কথা বুঝতে যেয়ো না।

৯১. অর্থাৎ তিনি যে শুধু তাদের প্রকাশ্য কর্মতৎপরতাই জানেন তাই নয় বরং তারা মনের মধ্যে যেসব মারাত্মক ধরনের হিংসা–বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখে এবং যে সব চক্রান্ত ও কূট কৌশলের কথা মনে মনে চিন্তা করতে থাকে, সেগুলোও তিনি জানেন। তাই যখন তাদের সর্বনাশের সময় এসে যাবে তখন তাদেরকে পাকড়াও করা যেতে পারে এমন একটি জিনিসও বাদ রাখা হবে না। এটি ঠিক এমন এক ধরনের বর্ণনা ভংগী যেমন একজন শাসক নিজ এলাকার কোন বদমায়েশকে বলে, তোমার সমস্ত কীর্তিকলাপের খবর আমি রাখি। এর অর্থ কেবল এতটুকুই হয় না যে, তিনি যে সবকিছুই জানেন একথা তাকে শুধু জানিয়েই দিচ্ছেন বরং এই সংগে এ অর্থও হয় যে, তুমি নিজের তৎপরতা থেকে বিরত হও, নয়তো মনে রেখো, যখন পাকড়াও হবে তখন প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য তোমাকে পুরোপুরি শাস্তি দেয়া হবে।

৯২. এখানে কিতাব মানে কুরআন নয় বরং মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর রেকর্ড, যাতে ছোট বড় ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সবকিছু রক্ষিত আছে।

৯৩. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় বক্তব্যের সাথে একথাটির সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ এই অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহর জ্ঞানের একটি প্রকাশ হচ্ছে এই যে, একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে এ কুরআনে এমন সব ঘটনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে যা বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে ঘটেছে। অথচ বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যেও তাদের নিজেদের ইতিহাসের এসব ঘটনার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে (এর নজির এ সূরা নামলের প্রথম দিকের রুকু'গুলোতেই পাওয়া যাবে, যেমন আমরা টীকায় বলেছি)। আর পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যেভাবে মহান আল্লাহ ঐসমস্ত মত বিরোধের ফায়সালা করে দিয়েছেন অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যেও যে মতবিরোধ চলছে তারও ফায়সালা করে দেবেন। তাদের মধ্যে কে সত্যপন্থী এবং কে মিথ্যাপন্থী তা তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন। কার্যত এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতেই এ ফায়সালা দুনিয়ার সামনে এসে গেলো। গোটা আরব ভূমিতে এবং সমগ্র কুরাইশ গোত্রে এমন এক ব্যক্তি ছিল না যে একথা মেনে নেয়নি যে, আবু জেহেল ও আবু লাহাব নয় বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের নিজেদের সন্তানরাও একথা মেনে নিয়েছিল যে, তাদের বাপদাদারা ভুল ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৯৪. অর্থাৎ তাদের জন্য যারা এ কুরআনের দাওয়াত গ্রহণ করে এবং কুরআন যা পেশ করছে তা মেনে নেয়। এ ধরনের লোকেরা তাদের জাতি যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে তা থেকে রক্ষা পাবে। এ কুরআনের বদৌলতে তারা জীবনের সহজ সরল পথ লাভ করবে এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা এর কল্পনাও আজ করতে পারে না। এ অনুগ্রহের বারিধারাও মাত্র কয়েক বছর পরই দুনিয়াবাসী দেখে

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

আর যখন আমার কথা সত্য হবার সময় তাদের কাছে এসে যাবে[১০০] তখন আমি তাদের জন্য মৃত্তিকা গর্ভ থেকে একটি জীব বের করবো। সে তাদের সাথে কথা বলবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত বিশ্বাস করতো না।[১০১]

নিয়েছে। দুনিয়াবাসী দেখেছে, যেসব লোক আরব মরুর এক অখ্যাত অজ্ঞাত এলাকায় অবহেলিত জীবন যাপন করছিল এবং কুফরী জীবনে বড়জোর একদল সফল নিশাচর দস্যু হতে পারতো তারাই এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর সহসাই সারা দুনিয়ার নেতা, জাতি সম্পদের পরিচালক, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষক এবং দুনিয়ার একটি বিশাল ভূখণ্ডের শাসনকর্তায় পরিণত হয়ে গেছে।

৯৫. অর্থাৎ কুরাইশ বংশীয় কাফের ও মু'মিনদের মধ্যে।

৯৬. অর্থাৎ তাঁর ফায়সালা প্রবর্তন করার পথে কোন শক্তি বাধা দিতে পারে না এবং তাঁর ফায়সালার মধ্যে কোন ভুলের সম্ভাবনাও নেই।

৯৭. অর্থাৎ এমন ধরনের লোকদেরকে, যাদের বিবেক মরে গেছে এবং জিদ এক গুয়েমী ও রসমপূজা যাদের মধ্যে সত্য মিথ্যার পার্থক্য উপলব্ধি করার কোন প্রকার যোগ্যতাই বাকি রাখেনি।

৯৮. অর্থাৎ যারা তোমার কথা শুনবে না বলে শুধু কান বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং যেখানে তোমার কথা তাদের কানে প্রবেশ করতে পারে বলে তারা আশংকা করে সেখান থেকে তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

৯৯. অর্থাৎ তাদের হাত ধরে জোর করে সোজা পথে টেনে আনা এবং তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলা তোমার কাজ নয়। তুমি তো কেবলমাত্র মুখের কথা এবং নিজের চারিত্রিক উদাহরণের মাধ্যমেই জানাতে পারো যে, এটি সোজা পথ এবং এসব লোক যে পথে চলছে সেটি ভুল পথ। কিন্তু যে নিজের চোখ বন্ধ করে নিয়েছে এবং যে একদম দেখতেই চায় না তাকে তুমি কেমন করে পথ দেখাতে পারো।

১০০. অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

১০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) বক্তব্য হচ্ছে, যখন দুনিয়ার বুকে সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মতো কোন লোক থাকবে না তখনই এ ঘটনা ঘটবে। ইবনে মারদুইয়াহ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলছেন, তিনি একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছিলেন। এ থেকে জানা যায়, যখন মানুষ সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করবে না তখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ একটি জীবের মাধ্যমে শেষ মামলা দায়ের করবেন। এটি একটিই জীব হবে অথবা একটি বিশেষ ধরনের প্রজাতির জীব বহু সংখ্যায় সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে, একথা সুস্পষ্ট নয়।

— دابة من الارض শব্দগুলোর মধ্যে দু'ধরনের অর্থের সম্ভাবনা আছে। মোটকথা সে যে কথা বলবে তা হবে এই ঃ আল্লাহর যেসব আয়াতের মাধ্যমে কিয়ামত আসার ও আখেরাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার খবর দেয়া হয়েছিল লোকেরা সেগুলো বিশ্বাস করেনি, কাজেই এখন দেখো সেই কিয়ামতের সময় এসে গেছে এবং জেনে রাখো, আল্লাহর আয়াত সত্য ছিল। "আর লোকেরা আমাদের আয়াত বিশ্বাস করতো না" এ বাক্যাংশটি সেই জীবের নিজের উক্তির উদ্ধৃতি হতে পারে অথবা হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উক্তির বর্ণনা। যদি এটি তার কথার উদ্ধৃতি হয়ে থাকে, তাহলে এখানে "আমাদের" শব্দটি সে ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করবে যেমন প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী "আমরা" অথবা "আমাদের" শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ সে সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলছে, ব্যক্তিগতভাবে নিজের পক্ষ থেকে বলছে না। দ্বিতীয় অবস্থায় কথা একেবারে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তার কথাকে যেহেতু নিজের ভাষায় বর্ণনা করছেন, তাই তিনি "আমাদের আয়াত" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এ জীব কখন বের হবে? এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং একদিন দিন দুপুরে এ জানোয়ার বের হয়ে আসবে। এর মধ্যে যে নিদর্শনটিই আগে দেখা যাবে সেটির প্রকাশ ঘটবে অন্যটির কাছাকাছিই।" (মুসলিম) মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থগুলোতে অন্য যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালের আবির্ভাব। ভূগর্ভের প্রাণীর প্রকাশ, ধোঁয়া ও সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া— এগুলো এমন সব নিদর্শন যা একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে।

এ জীবের সারবস্তু (Quiddity) ও আকৃতি–প্রকৃতি কি, কোথায় থেকে এর প্রকাশ ঘটবে এবং এ ধরনের অন্যান্য অনেক বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো পরস্পর বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। এগুলোর আলোচনা কেবলমাত্র মানসিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সাহায্য করবে এবং এগুলো জেনে কোন লাভও নেই। কারণ কুরআনে যে উদ্দেশ্যে এর উল্লেখ করা হয়েছে এ বিস্তারিত বর্ণনার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

এখন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপার হলো, একটি প্রাণী এভাবে মানুষের সাথে মানুষের ভাষায় কথা বলার হেতু কি? আসলে এটি আল্লাহর অসীম শক্তির একটি নিদর্শন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বাকশক্তি দান করতে পারেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি তো শুধুমাত্র একটি প্রাণীকে বাকশক্তি দান করবেন কিন্তু যখন কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে তখন আল্লাহর আদালতে মানুষের চোখ, কান ও তার গায়ের চামড়া পর্যন্ত কথা বলতে থাকবে। যেমন কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .... وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ (حم السجدة :٢١-٢٠)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

৭ রুকূ'

আর সেদিনের কথা একবার চিন্তা করো, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে এমন সব লোকদের এক একটি দলকে ঘেরাও করে আনবো যারা আমার আয়াত অস্বীকার করতো। তারপর তাদেরকে (তাদের শ্রেণী অনুসারে স্তরে স্তরে) বিন্যস্ত করা হবে। অবশেষে যখন সবাই এসে যাবে তখন (তাদের রব তাদেরকে) জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা আমার আয়াত অস্বীকার করেছো অথচ তোমরা জ্ঞানগতভাবে তা আয়ত্ত করোনি?[১০২] *যদি এ না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা আর কি করছিলে"*[১০৩] *আর তাদের জুলুমের কারণে আযাবের প্রতিশ্রুতি তাদের ওপর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না। তারা কি অনুধাবন করতে পারেনি, আমি তাদের প্রশান্তি অর্জন করার জন্য রাত তৈরি করেছিলাম এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছিলাম?*[১০৪] *এরি মধ্যে ছিল অনেকগুলো নির্দশন যারা ঈমান আনতো তাদের জন্য।*[১০৫]

১০২. অর্থাৎ কোন তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে তোমরা এ আয়াতগুলোর মিথ্যা হবার কথা জানতে পেরেছিলে, এ আয়াতগুলো অস্বীকার করার পেছনে তোমাদের এ কারণ কখনোই ছিল না। তোমরা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলে।

১০৩. অর্থাৎ যদি এমন না হয়, তাহলে কি তোমরা একথা প্রমাণ করতে পারবে যে, গবেষণা-অনুসন্ধানের পর তোমরা এ আয়াতগুলোকে মিথ্যা পেয়েছিলে এবং সত্যিই কি তোমরা এ আয়াতগুলোয় যা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রকৃত সত্য নয়, এ ধরনের কোন জ্ঞান লাভ করেছিলে?

১০৪. অর্থাৎ অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এ দু'টি নিদর্শন এমন যে, তারা হরহামেশা তা দেখে আসছিল। তারা প্রতি মুহূর্তে এগুলোর সাহায্যে লাভবান হচ্ছিল। কোন অন্ধ, বধির ও বোবার কাছেও এ দু'টি গোপন ছিল না। কেন তারা রাতের বেলা আরাম করার মুহূর্তে

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۖ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۖ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ إِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

আর কি হবে সেদিন যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং ভীত–বিহবল হয়ে পড়বে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই[১০৬]—তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ এ ভীতি–বিহবলতা থেকে রক্ষা করতে চাইবেন—আর সবাই তাঁর সামনে হাজির হবে কান চেপে ধরে। আজ তুমি দেখছো পাহাড়গুলোকে এবং মনে করছো ভালই জমাটবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে সময় এগুলো মেঘের মতো উড়তে থাকবে। এ হবে আল্লাহর কুদরতের মূর্ত প্রকাশ, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বিজ্ঞতা সহকারে সুসংবদ্ধ করেছেন? তিনি ভালোভাবেই জানেন তোমরা কি করছো।[১০৭]

এবং দিনের সুযোগে লাভবান হবার সময় একথা চিন্তা করেনি যে, এক মহাবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় সত্তা এ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন এবং তিনি তাদের যথাযথ প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন? এটি কোন আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। কারণ এর মধ্যে উদ্দেশ্যমুখীনতা, বিজ্ঞানময়তা ও পরিকল্পনা গঠনের ধারা প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে। এগুলো কোন অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির গুণাবলীও হতে পারে না। আবার এগুলো বহু খোদার কার্যপ্রণালীও নয়। কারণ নিসন্দেহে এ ব্যবস্থা এমন কোন এক জনই স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক–ব্যবস্থাপক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যিনি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য সকল গ্রহ–নক্ষত্রের ওপর কর্তৃত্ব করছেন। কেবলমাত্র এ একটি জিনিস দেখেই তারা জানতে পারতো যে, সেই একক স্রষ্টা তাঁর রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে সত্য বর্ণনা করেছেন এ রাত ও দিনের আবর্তন তারই সত্যতা প্রমাণ করছে।

১০৫. অর্থাৎ এটি কোন দুর্বোধ্য কথাও ছিল না। তাদেরই ভাই–বন্ধু তাদেরই বংশ ও গোত্রের লোক এবং তাদেরই মত মানুষরাই তো এ নিদর্শনগুলো দেখে স্বীকার করেছিল যে, নবী যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও তাওহীদের দিকে আহবান জানাচ্ছেন তা প্রকৃত সত্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।

১০৬. শিংগার ফুৎকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন'আম ৪৭, সূরা ইবরাহীম ৫৭, সূরা তা–হা ৭৮, সূরা হজ্জ ১, সূরা ইয়াসীন ৪৬–৪৭ এবং সূরা যুমার ৭৯ টীকা।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾
وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ
الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۫ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾
وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশী ভালো প্রতিদান পাবে[১০৮] এবং এ ধরনের লোকেরা সেদিনের ভীতি–বিহবলতা থেকে নিরাপদ থাকবে।[১০৯] আর যারা অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে অধোমুখে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা কি যেমন কর্ম তেমন ফল—ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান পেতে পারো?[১০৯(ক)]

("হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো) আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে, আমি এ শহরের রবের বন্দেগী করবো, যিনি একে হারামে পরিণত করেছেন এবং যিনি সব জিনিসের মালিক।[১১০] আমাকে মুসলিম হয়ে থাকার এবং এ কুরআন পড়ে শুনাবার হুকুম দেয়া হয়েছে।" এখন যে হেদায়াত অবলম্বন করবে সে নিজেরই ভালোর জন্য হেদায়াত অবলম্বন করবে এবং যে গোমরাহ হবে তাকে বলে দাও, আমি তো কেবলমাত্র একজন সতর্ককারী। তাদেরকে বলো, প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, শিগ্‌গির তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেবেন এবং তোমরা তা চিনে নেবে। আর তোমরা যেসব কাজ করো তা থেকে তোমার রব বেখবর নন।

১০৭. এ ধরনের গুণ সম্পন্ন আল্লাহর কাছে আশা করো না যে, তাঁর দুনিয়ায় তোমাদের বুদ্ধি–জ্ঞান, সত্য–মিথ্যার পার্থক্য করার যোগ্যতা এবং তাঁর প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করার পর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর থাকবেন। তাঁর যমীনে বসবাস করে তোমরা তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা–ইখতিয়ার কিভাবে ব্যবহার করছো তা তিনি দেখবেন না, এমনটি হতে পারে না।

১০৮. অর্থাৎ এদিক দিয়েও সে ভালো অবস্থায় থাকবে যে, যতটুকু সৎকাজ সে করবে তার তুলনায় বেশী পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। আবার এদিক দিয়েও যে, তার সৎকাজ তো ছিল সাময়িক এবং তার প্রভাবও দুনিয়ায় সীমিত কালের জন্য ছিল কিন্তু তার পুরস্কার হবে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

১০৯. অর্থাৎ কিয়ামত, হাশর ও বিচারের দিনের ভয়াবহতা সত্য অস্বীকারকারীদেরকে ভীত, সন্ত্রস্ত, হত–বিহবল ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে দিতে থাকবে এবং তাদের মাঝখানে এ সৎকর্মশীল লোকেরা নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে। কারণ এসব কিছু ঘটবে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী। ইতিপূর্বেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের দেয়া খবর অনুযায়ী তারা ভালোভাবেই জানতো, কিয়ামত হবে, আর একটি ভিন্ন জীবনধারা শুরু হয়ে যাবে এবং সেখানে এসব কিছুই হবে। তাই যারা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ বিষয়গুলো অস্বীকার করে এসেছে এবং এগুলো থেকে গাফিল থেকেছে তারা যে ধরনের আতংকিত ও ভীত–সন্ত্রস্ত হবে, এ সৎকর্মশীলরা তেমনটি হবে না। তারপর তাদের নিশ্চিন্ততার আরো কারণ হবে এই যে, তারা এ দিনটির প্রত্যাশা করে এর জন্য প্রস্তুতির কথা চিন্তা করেছিল এবং এখানে সফলতা লাভ করার জন্য কিছু সাজ–সরঞ্জামও দুনিয়া থেকে সংগে করে এনেছিল। তাই তারা তেমন কোন আতংকের শিকার হবে না যেমন আতংকের শিকার হবে এমনসব লোক যারা নিজেদের জীবনের সমস্ত পুঁজি ও উপায়–উপকরণ দুনিয়াবী কামিয়াবী হাসিলের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছিল এবং কখনো একথা চিন্তা করেনি যে, পরকাল বলে একটি জীবন আছে এবং সেখানকার জন্য কিছু সাজ সরঞ্জামও তৈরী করতে হবে। অস্বীকারকারীদের বিপরীতে এ মু'মিনরা এখন নিশ্চিন্ত হবে। তারা মনে করবে, যেদিনের জন্য আমরা অবৈধ লাভ ও আনন্দ ত্যাগ করেছিলাম এবং বিপদ ও কষ্ট বরদাশ্‌ত করেছিলাম সে দিনটি এসে গেছে, কাজেই এখন এখানে আমাদের পরিশ্রমের ফল নষ্ট হবে না।

১০৯(ক). কুরআন মজীদের বহু জায়গায় একথা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আখেরাতে অসৎ কাজের প্রতিদান ঠিক ততটাই দেয়া হবে যতটা কেউ অসৎ কাজ করেছে এবং সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ মানুষের প্রকৃত কাজের তুলনায় অনেক বেশী দেবেন। এ সম্পর্কিত আরো বেশী দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন সূরা ইউনুস ২৬–২৭, আল কাসাস ৮৪, আনকাবুত ৭, সাবা ৩৭–৩৮ এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

১১০. এ সূরা যেহেতু এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন ইসলামের দাওয়াত কেবলমাত্র মক্কা মু'আয্যমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এ দাওয়াতে কেবলমাত্র মক্কার অধিবাসীদেরকেই সম্বোধন করা হচ্ছিল। তাই বলা হয়েছে ঃ "আমাকে এ শহরের রবের বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়েছে।" এ সংগে এ রবের যে বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি একে সুরক্ষিত ও পবিত্রতম স্থানে পরিণত করেছেন। এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, চরম অশান্তি, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ, ও রক্তপাত বিধ্বস্ত আরব ভূখণ্ডের এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করে যে আল্লাহ তোমাদের প্রতি এ বিপুল অনুগ্রহ করেছেন এবং যাঁর অনুগ্রহে তোমাদের এ শহর সমগ্র আরব দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, তোমরা তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে চাইলে হতে পারো কিন্তু আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে আমি যেন তার

কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হই এবং তাঁরই সামনে নিজের বিনয় ও নম্রতার শির নত করি। তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছ তাদের কারো এ শহরকে হারামে পরিণত করার এবং আরবের যুদ্ধপ্রিয় ও লুটেরা গোত্রগুলোকে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই আসল অনুগ্রহকারীকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার সামনে মাথা নত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যাদের আমার প্রতি সামান্যতমও অনুগ্রহ ও অবদান নেই।